ক্যাপ্টেনের মুখ

শেখর সেনগুপ্ত

সাহিত্য প্রকাশ

৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

CAPTAINER MUKH

By

SEKHAR SENGUPTA

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অলোকশঙ্কর মৈত্র

মুদ্রাকর : তনুশ্রী প্রিণ্টার্স : কলিকাতা-৬

প্রয়াত সুহৃদ কবি সুব্রত চক্রবর্তীকে

প্রাসঙ্গিক

ক'লকাতার ক্লাবে-ময়দানে, টেলিভিশনের পর্দায় ভাষ্যকার হিসেবে অথবা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন [বেঙ্গল সার্কেল]-এর কোনো সভার সুদৃশ্য বক্তৃতামঞ্চে যাঁর শ্যামল দীঘল বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখতে দেখতে বিবিধ মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি, সেই সঞ্জীব বসুই আমাকে আবিষ্কার করলেন নেহেরু স্টেডিয়ামের সামনে এবং স্বভাবসিদ্ধ পূর্ববঙ্গীয় টানে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কিরে, তুই শেখর না ?'

'সঞ্জীবদা !'

—আমি ঈষৎ পুলক ও স্বস্তির সঙ্গে দু'জনের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনি। এককালের ভারতীয় ফুটবলের তুখোড় রাইটআউট প্রায় অল-আউট ভঙ্গীমায় আমার রোদ-তাতা মুখের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'তুই দিল্লীতে ? এশিয়াড ছাখতে আইছোস ?'

আমি আধময়লা প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সপ্রতিভ, 'এশিয়াডের এখনো তিন দিন বাকি। তা ছাড়া আমার কোনো টিকিট নেই। স্রেফ রাজধানী দেখতে চলে এলাম।'

সঞ্জীবদার চোখ কপালে ওঠে, 'কস কি ! তিন দিন পর এশিয়াড ! ভিড়ের মধ্যে কামড়াকামড়ি, মানুষ মানুষের মাথা খাইতেছে ! আর তুই আইছোস রাজধানী দেখতে ! তোর এই পাগলামি কবে যাইবো ?'

পাগলামিটা আমার মজ্জায়, মজ্জায়।

আর কোনো সাধ নেই মনে

ভ্রমি কেবল ভুবনে ভুবনে।

লোকান্তর পিতা সদাশয়, বিষয়-সম্পত্তি কিছুই রেখে যান নি। চাকুরিটাই আমার জমিদারী, কিছু কিছু অফিসিয়াল চিন্তা ও চর্চায় দক্ষতা হেতু বছর ছয়েক আগে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া আমাকে অফিসার্স গ্রেডে উন্নীত করেছেন। তদুপরি বাজারে আমার মোটামুটি একটা চাহিদা

থাকায় সম্পন্ন ঘরের একটি শিক্ষিতা রমণী ঘরণী হ'য়ে এলেন, যাঁর কেবল বুদ্ধিদীপ্ত লাবণ্যটুকুই আসল নয়, আমার মতন বাউণ্ডুলেকেও প্রায় আদ্যোপান্ত সংসারী ক'রে তুলেছেন। ক্রমে একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে ঠিক যেন সরকারী ছক মিলিয়ে,—অফিস-ফেরৎ বাড়ি ফিরলেই ওদের অনেক জিজ্ঞাসার পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব দিতে হয়।

কিন্তু ইত্যাকার ধারাবাহিক বিবর্তন সত্ত্বেও আমি অতিক্রম করতে পারিনি সেই আবাল্য দুর্মর নেশাকে, সময় পেলেই ঝুপ্ ক'রে একাকী সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া, যেখানে আমি অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পাই অথবা, কখনো মৃত্যুকাম হ'য়ে উঠি,—এই নেশা আমাকে আজো চূড়ান্তভাবে দখল ক'রে আছে।···

দু'জনে 'কাফে মিনিয়েচার'-এ ঢুকলাম। দিল্লীর চাঞ্চল্য এখানেও। অনেক খুঁজে-পেতে এককোণে একটা টেবিল ও দুটো চেয়ারের দখল নি।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সঞ্জীবদা বললেন, 'উঠছোস কোথায় ?'

দুঃখীর মতন মাথা নাড়ি, 'কেউ ঠাই দিচ্ছে না।'

সঞ্জীবদা একটু অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন, 'তয় কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেছোস ?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'আক্ষরিক সত্য। তবে এখানে থাকছি তো মোটে একটা দিন আর একটা রাত। কাল সকালেই বাসে চেপে সোজা হরিদ্বার।'

সঞ্জীবদার বিরক্তি বাড়ে, 'হরিদ্বারেই থাকলে পারতি; দিল্লীরে শিখণ্ডী বানাইলি ক্যান ?'

একগাল হাসির সঙ্গে বললাম, 'এশিয়াডের টিভি ভাষ্যকার সঞ্জীব বসুর সঙ্গে মুলাকাৎ হবে, এই আশায়।'

'হারামজাদা !'—মুহূর্তে আমার মাথার ওপর সঞ্জীব বসুর বিশাল থাবা উদ্যত হ'য়ে থাকে, যদিও নেমে আর আসে না।

কথা যতই চোখাচোখা হোক, দায়িত্ব একটা বর্তেছে। অর্থাৎ

আমাকে নিয়ে এবার তিনি ইতিউতি ঘুরতে থাকেন স্রেফ এক রাতের জন্য ঠাই জুটিয়ে দিতে। নিজে অবিশ্যি পাঁচতারায় আছেন সরকারী বদান্যতায়, যেখানে আমার অবস্থান নিশ্চিত নিষেধ। দিল্লীতে এখন যুদ্ধকালীন পরিবেশ—সকলেই বুঝি সমরাগ্নিতে জ্বলছে। অথবা, প্রাচীন রোমক সেনাপতি যেন বিশাল কোনো যুদ্ধ বিজয়ের পর প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং তাঁকে স্বাগত জানাতে জমায়েত বিপুল উৎসবমুখর জনতা। ফেস্টুনে ফেস্টুনে ছয়লাপ,—ভাষা কোথাও কাঁচা, কোথাও বিদ্বজ্জনের প্রভাব। এশিয়াড এশিয়াড বহতায় দিল্লী নিজেকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছে ; ক'লকাতার মতন একে কোরামিন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজন হবে না। তবে ঐ রাতারাতি যৌবন লাভে যা হয়,—গাম্ভীর্য নিরুদ্দেশ, চটুল সুন্দরীটি হ'য়ে অতীতের গুটি কেটে প্রজাপতি। কী ভয়ংকর লোহা-লক্কড়-ইট-কাঠ-সিমেন্টের ব্যবহার ও অপব্যবহার। প্রণববাবুর বাজেটে সিমেন্টের দাম একলাফে ত্রিশ থেকে বাষট্টি হওয়ায় আমার স্ব-গৃহ নির্মাণের আশোবাসনা সেই যে মুখ থুবড়ে পড়েছে, এখনো তার রক্তক্ষরণ চলেছে। দিল্লীর কর্মকাণ্ড দেখে ক্ষতস্থানটা আরো টাটিয়ে ওঠে।

একটি টেম্পোতে চেপে দু'জনে চলেছি। ভূগোল জানি না জানি, হণ্টন মারায় আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু সঞ্জীব বসু হাঁটবেন না, বিশেষতঃ সময়ের মূল্য তাঁর কাছে অনেক। টেম্পোর গায়েও বেচারি আপ্পুর ছবি, কিন্তু ত্রিপলটা ছিঁড়ে যাওয়ায় ছবিটা উড়ন্ত পাখির ডানার মতন কখনো পূবে, কখনো পশ্চিমে।

সঞ্জীবদা ঐকান্তিক। অনেক জায়গাতেই ঢুঁ মারলেন আমাকে নিয়ে। হোটেলগুলি চোখ উল্টেই বসেছিল। এমনকি, সঞ্জীবদার বিশেষ পরিচিতা রীতাদি'ও ভীষণ দুঃখের সঙ্গে অক্ষমতা জানালেন,—বাড়িতে তার দুই ননদ স্বামীদের ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে গুলজার করছেন এশিয়াডের খানকয়েক টিকিট ফুটানিকা ডিব্বার মধ্যে পুরে রেখে।

রাগে সঞ্জীবদা ক্রমশই বেগুনীবর্ণ ধারণ করছেন। যুনিয়নের পাণ্ডা হবার ঝকমারি ষোলআনার ওপর আঠারোআনা। বিশেষতঃ স্টেট

ব্যাঙ্কে অফিসারদের নিয়ে য়ুনিয়ন করা। সব অফিসারই চায় ঘরের কাছে পোস্টিং, আর ম্যানেজমেন্ট চায়, ট্রান্সফার-ট্রান্সফার খেলায় কাকে কতটা উদ্বিগ্ন করে রাখা যায়,—এই দুই মেরুর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে য়ুনিয়নবাজি চালানো খুব ঝকমারি। সকলের সহ্য হয় না। লড়াইটা গড়াতে গড়াতে কখনো কোর্ট অব্দি যায়, কখনো খোদ অর্থমন্ত্রী নাক গলান, নেতারা চার্জশিটকে ভ্রূক্ষেপ করেন না; আবার কখনো কখনো সদস্যদের বুকের রক্ত দিয়ে সেবা করতে আহ্বান জানান নিজের কর্মস্থলকে। আর সত্যি কথা বলতে কি আজকের ব্যাঙ্কগুলিকে তো অফিসাররাই এখনো টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তো অফিসারদের যিনি য়ুনিয়ন-লিডার, তাঁর শত্রু অজস্র। এমন সমস্ত লিফলেট তাঁর বা তাঁদের নামে বাজারে ছাড়া হয়, যাদের ভাষা ও বিষয়বস্তু পাঠ করলে কাঠ বর্বরও লজ্জা পাবে, চোখ উঠবে চড়কগাছে। সঞ্জীবদারও অনেক বদনাম, শত্রুসংখ্যা কম নয়। কাজেই আমি এটা মেনে নিতে পারি যে, অন্ততঃ আমার কাছে নিজের ইমেজটাকে সফেদ রাখবার জন্য এই বেআদবিটুকু এখনো সহ্য করছেন!

গোখেল এভিনিউতে টেম্পোটাকে ছেড়ে দিলাম। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টেম্পোওয়ালার মনোবৃত্তি ও লোভ এখন এক্সটেম্পো, দাবির মাপজোখ নেই,—পনেরোটাকার বদলে পঁচিশটাকা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বুকপকেটে গুঁজে ভোঁ।

দিল্লীর মূল হৃৎপিণ্ড থেকে গোখেল এভিনিউ-এর বেশ কিছুটা দূরত্ব। একটু নিরিবিলি। কিন্তু এশিয়াড নিয়ে এখানেও চতুর্দিকে বিজ্ঞাপনী বর্ণমালা। একটা বাস থামলো এবং চলতে শুরু করলো। কণ্ডাকটরের গর্জন এবং যাত্রীর আর্ত চোখ। আমি আমার জীবদ্দশায় দিল্লীর বাস-কণ্ডাকটরদের মতন প্রবলপ্রতাপ চাকুরে আর দেখতে পাবো বলে আশা করি না।

সঞ্জীব বসু আমাকে নিয়ে নাস্তানাবুদ। আমার একখানা হাত চেপে ধরে গোঁয়ারের মতন রাস্তা পার হচ্ছেন, আর গজগজ করছেন, 'এক ব্যাটা চাটগাইয়া এইখানে একটা হোটেল খুলছে। দেখি তর জন্য শেষ চেষ্টা কইর‍্যা। ভাত তো পাবিই, মন চাইলে মদ-মাগীও পাবি।'

এ যেন কালিগোলা অন্ধকারে পেঁচার দুটো চোখ দেখে আচমকা চমকে ওঠা। ভাত আমি খাই; ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে মালের আসরেও বসেছি তূরীয়আনন্দের ধান্দায়; কিন্তু মেয়েমানুষ খুঁজতে কখনো কোনো অন্ধ অলিন্দে গিয়ে দাঁড়াইনি, যদিও শুনেছি ইদানীং আখেরে কাজ গুছাতে ইহা অপেক্ষা উপাদেয় উপঢৌকন নাকি আর হয় না।…

তা সঞ্জীবদা আমাকে নিয়ে যে চাটগাইয়া হোটেলে হাজির হলেন, সেটা আয়তনে তেমন বৃহৎ নয়, আপাতনজরে ছিমছাম, মন হৃষ্ট হয়। হয়তো এর মালিকের অনেক ফুরসাৎ। কারুরই তাড়াহুড়ো নেই। নামটাও আটপৌরে, নামে কোনো কাব্যি বা ফিচেলপনা নেই,—ম্যাটম্যাটে লাল রঙে লেখা সাইনবোর্ড 'ভৈরব ফনীর হোটেল।'

কিন্তু ভৈরবফনী-ভৈরবফনী-ভৈরবফনী—এই নামটা আমাকে ঈষৎ নড়িয়ে দিলো। কোথায় যেন শুনেছি নামটা। মনে গেঁথেও ছিল কিছুকাল। কোথায়? রাজ্যপাল ভৈরবদাস পাণ্ডের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছি? অথবা আমাদের ব্রাঞ্চের দশাসই স্টাফ ভৈরবচন্দ্ এসে যাচ্ছে? কিংবা নামী সাইকেল-খেলোয়াড় ত্রিনাথ ফনী ছায়া ফেলছে? হবেও বা।

তা যে ফনীই হোক, বাহাদুরি আছে। সিন্ধী-পাঞ্জাবীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হোটেল তো একটা চালাচ্ছে দিল্লীর বুকে। আর বর্তমান যুগে হোটেল-ব্যবসায়ে পয়সার মুখ দেখতে হলে কেবল যে খানা-পিনার বন্দোবস্ত করলেই চলে না, এটা প্রত্যেক বোঝদারই মেনে নেবেন। সঞ্জীবদা তো মানবেনই, যেহেতু ওঁর নিজেরই এককালে শিয়ালদহে একটি হোটেলের মালিকানা ছিল।

পাকাপোক্ত নতুন দোতলা, এখনো রঙ ও চুনের টাটকা গন্ধ।

বললাম, 'একেবারে নতুন হোটেল।'

সঞ্জীবদা ঠোঁট উল্টালেন, 'না। বাড়িটা ছিল একেবারে ঝরঝরে কংকাল। বউটা ডুইব্যা মারা যাওয়ার পর ফনীশাই পুরনো কংকালের ওপর নতুন গতি লাগাইছে।'

লম্বা বারান্দা। বারান্দায় মোট দুটো বেসিন। একটা বেসিনে

টথপেস্টের দাগ, অন্যটায় ঝোলের। বেশ কিছুসংখ্যক মাছিও আছে। লাল রং সিমেন্টের ওপর অজস্র পদচিহ্ন। এসব মেনে নিই, নিতে হয়। দেয়ালে তো কুসুম কুসুম রং।

দু'ধারে পর পর কালো দরজা, অর্থাৎ পর পর ঘরের মেলা। দিল্লীর বুকে এতগুলি ঘর থাকা মানেই ব্যবসায়িক যুদ্ধে শতকরা আশিভাগ জয়লাভ। প্রতিটি দরজার ওপর টিনের পাতে লেখা রুম নম্বর এবং দেয়ালে গাঁথা কলিংবেল। আজকাল এই কলিংবেল বস্তুটি কত না আকহার। এক একটায় এক-এক রকম ধ্বনি। বর্ধমানে আমাদের পাড়ায় এক ডাক্তারবাবু তাঁর কলিং-বেলে নিয়ে এলেন প্রায় শেয়ালের ডাক; শুনতে পেয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ ঐ এলাকারই প্রতিষ্ঠিত দর্জি বীরেনবাবু তাঁর কলিংবেলে স্থাপন করলেন রীতিমতন কুকুরের ঘেউ ঘেউ। ফাগুবাবুর হোটেলেও কি এক একটি বেলে এক-এক রকম সুরতরঙ্গ? অর্থাৎ, যদি কোনোটায় বিটাফেন, কোনোটায় মেনহুইন, কোনোটায় রবিশংকর ঝংকৃত হয়? কোনো কোনো কপাট একটু ফাঁক; ফাঁকের মধ্য দিয়ে ভেসে ওঠে জলের কলসী, ঈষৎ ঝুঁকে থাকা গালে-হাত ধবধবে যুবতীর ভগ্নাংশ, যা প্রায় বিষদাঁতের সামিল, পাজামা-পরা গোল-পেট পুরুষ, অর্ধাবদন বৃদ্ধের মুখে সিগ্রেট এবং জানালা দিয়ে চুইয়ে-নামা একফালি রোদ্দুর।

এরই মধ্যে আকারে-প্রকারে সবচেয়ে বড় ঘরটি একেবারে হাট এবং সেখানেই অফিস। আমাদের প্রবেশের মুখে বৃষস্কন্ধ মধ্যবয়সী একটি লোক বেরিয়ে গেল। তার ঠোটের কোণে কৌতুকের আভাস দেখতে পেলাম।

ভেতরে ব্যবসায়িক গদিসুলভ পারিপাট্য। যথারীতি গণেশের মূর্তি সবার ওপর; আত্মারাম একপাশে, বাবা তারকনাথ আরেকপাশে; দেয়ালে কয়েকখানা সস্তা নিসর্গচিত্র; কিন্তু একটি বাঁধানো ছবি আমাকে ঈষৎ চমকে দেয়,—ছবিটা একটা দ্বীপের, যার নাম ও পরিবেশের সঙ্গে একদা আমার চকিত পরিচিতি ঘটেছিল। ল্যাণ্ডফল। নিশ্চয় কোনো জাহাজ থেকে তোলা ছবি। বে অফ বেঙ্গলের আছাড়-পিছাড়ি। দুটো

আতকায় সামুদ্রিক পাখি নেমে আসছে ল্যাণ্ডফলের সবুজ গালিচায়। ল্যাণ্ডফল থেকে পোর্টব্লেয়ার আর কতদূর? ···মনে পড়ে, মনে পড়ে সেইক্ষণ—পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে শুভ দৃষ্টি হচ্ছে। অজস্র সবুজের রাজত্বে ধূসরবর্ণ বন্দর যেন দু' হাত বাড়িয়ে আছে। আমি চিরদিনই নাস্তিক। তাই কারুর উদ্দেশ্যে প্রণাম না ঠুকে নিজের বুকেই টোকা মারি এবং বলি: ঈশ্বরের বাগানবাড়ি, ঈশ্বরের বাগানবাড়ি!

···তারপর তারপর কতগুলি মুখ, কয়েকটা নাম এবং ঐ নামটা—ভৈরবফণী! কোথায় শুনেছি এবং কখন?···

ঘরময় ধূপ ও পারফিউমের গন্ধ মিলেমিশে মিশিয়ে আছে। দৃষ্টি নেমে এলো। সামনে অতিচ্চ খাটের ওপর ফুলকাটা তোষক, যেখানে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কর্তা প্রায় শাহজাহান। তিনি যে হোটেল-ম্যানেজার নন, খোদ মালিক,—এ কথাটা হলপ ক'রে বলা যায়। কারণ, ম্যানেজার কখনো তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে পারেন না অফিস ঘরে। ইনি প্রথম দর্শনেই রুগ্ন, সম্ভবত দুরন্ত হাঁপানি রোগে কাহিল, অহরহ শ্বাসকষ্টে স্যাঁতা ও শাদা হয়ে গেছে তার হাত-পা-মুখ।

কিন্তু কিছুক্ষণ তাঁর ঐ ক্লিষ্টমুখের দিকে চেয়ে থাকলে মালুম হয়, যৌবনে অথবা এই কিছুকাল আগেও তিনি অদ্ভুত রূপবান ছিলেন, কুমারটুলীর কার্তিক মূর্তি, যাঁর ঐ দুই টানা টানা বড় চোখে এখনো খুঁজে পাওয়া যাবে রোমান্টিক ভাবাবেগ। সুঁচলো মুখে দীর্ঘ নাশা, ঘন টানা ভুরু প্রায় জুলপি ছুঁই ছুঁই, এখনো মাথার চুল কুচকুচে এবং ঠোঁটজোড়া এখনো লাল; অথচ, রোগ তাকে হতদরিদ্র করেছে, কিন্তু এক ফুৎকারে রূপবানের গৌরববোধকে বিনষ্ট করতে পারেনি। আমাদের দেখেই তিনি ঈষৎ নড়ে-চড়ে উঠলেন, একখানা শীর্ণ সাদা হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে বললেন, 'ওয়েলকাম বোস, ওয়েলকাম।'

আমার ওপর নজর পড়তেই তাঁর উৎসাহ নিবৃত্ত হলো।

'ভালো আছেন, ফণীদা?'—বলতে বলতে একটা উঁচু-ঠ্যাং চেয়ারে বসলেন সঞ্জীবদা। আমিও দেখাদেখি আর একটায়।

'ফণীদা, একটা বিশেষ দরকারে এলাম', সঞ্জীব বসু ভৈরবফণীর নিরঙ্কুশ

আধিপত্যকে সম্মান জানিয়ে বলতে থাকেন, 'এ আমার বন্ধু, ব্যাঙ্কের অফিসার, মাত্র একদিনের জন্য দিল্লীতে এসে ফেঁসে গেছে। কোথাও ঠাঁই মেলা মুশকিল হবে জেনে সোজা আপনার কাছেই নিয়ে এলাম। ব্যবস্থা আপনাকে একটা করতেই হবে,—জাস্ট ফর এ নাইট।'

খেয়াল করিনি, কখন যেন বিটকেল চেহারার একটা লোক আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মালুম হলো তখন, যখন জবাবটা এলো তার কণ্ঠস্বর থেকে, 'ঠাঁই তো এখানেও নেই। কোনো ঘর খালি নেই। সব একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে ঠাসা।'

ভৈরবফণী বললেন, 'এ সময় দিল্লীতে ঢোকা মানেই বিপদে পড়া। আপনি যেমন সাহারা মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনো পুকুর আশা করতে পারেন না, তেমনি এশিয়াড-পাগল দিল্লীতে এসে শোবার জায়গা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অবশ্য আপনি যদি এককাড়ি টাকা ঢালতে পারেন, তা'হলে নিষ্কৃতির উপায় সর্বত্রই আছে।'

সঞ্জীবদা তাল দিলেন, 'ওটাই তো হচ্ছে মুশকিল। চাকুরে লোক, রেস্তর বড় টানাটানি। প্রচুর টাকা পেলে দিল্লীর অনেক বাড়িওয়ালা বউ সমেত তার শোবার ঘরটাই ছেড়ে দিতে রাজি।'

সঞ্জীবদার কথায় ভৈরবফণী কেমন যেন চমকে উঠলেন খুকখুক ক'রে বিদ্‌ঘুটে হাসি হেসে ওঠে বিটকেল লোকটা। ফণী যেন কোনো একটা অবলম্বন খুঁজতে গিয়ে শূন্যে হাত বাড়ান। আবার আমার মনে আসছে : আমি তোমার নাম শুনেছি ; তুমি, আন্দামান, এক জ্বলন্ত রূপসী এবং এক তরুণী সাহসী ক্যাপ্টেন। তুমিই কি সেই ? না, তা যদি হবে, তবে সেই রূপসী কোথায় ? স্মৃতি এবং কল্পনা এমন সব খেলা খেলে যে চক্ষুস্থির।...

সামলে নিয়েছেন ফণী। নীচু স্বরে বলতে থাকেন, 'আমার হোটেলে মোট পনেরোখানা ঘর। তারমধ্যে চোদ্দটাই ফিল-আপ।'

সঞ্জীবদা সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্কটা লুফে নিলেন, 'তা'হলে ঐ শেষের ঘরটাই এই ভায়ার জন্য বরাদ্দ করা হোক।'

কথাটা বলেই আমাকে একটি ছোট্ট খোঁচা মারলেন এবং আমি

ইশারা বুঝতে পেরে হাত কচলাতে কচলাতে বলি, 'আপনি দয়া না করলে নিরাশ্রয় হ'য়ে সারারাত পথে পথে ঘুবতে হবে।'

এমন মাখন-মাখানো স্বরে এর আগে কখনো বড়সাহেবেরও স্তুতি করিনি। এখনো যে করবার কোনো দরকার ছিল, তা নয়। আশ্রয় না জুটলে রেলের প্লাটফর্মে রাতটা অনায়াসে কাবার করে দিতুম। সঙ্গে তো রয়েছে আর্থার হেলীর 'মানি চ্যাঞ্জাব',—সরকারী বাড়িতে দিব্যি পড়তে পেতাম।

ভৈরবফণী গভীর দৃষ্টি মেলে দেখছেন আমাকে। আমিও তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। নিজের সরু থুতনিতে আঙুল বোলাতে বোলাতে হিম স্বরে বললেন, 'আমি দুঃখিত। ঐ ঘরে আমি কখনো কোনো বোর্ডারকে থাকতে দেই না।'

সঞ্জীবদা বললেন, 'কারণ?'

উত্তর এলো, 'কারণ, ঐ ঘরেই রাবেয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।'

আমার মগজে বিদ্যুতের চকিত চমক। প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'মিঃ ফণী, আপনি কি একসময় জাহাজের বাবুর্চি ছিলেন?'

ভৈরবফণীও বুঝি চাবুকের ঘায়ে লাফিয়ে উঠলেন। বিস্ময়ে ও কুটিলতায় রক্তাভ হ'য়ে উঠলো তাঁর মুখ, 'আপনি কি করে জানলেন?'

আমি চেয়ার থেকে নেমে দু' পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু কোনো জবাব দেই না।

ভৈরবফণী আবার প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি করে জানলেন?'

এক চিলতে বাঁকা হাসি ঠোঁটের কোণে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বললাম, 'আপনি যে মহিলাকে ফুঁসলে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর স্বামী ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ ছিলেন আমার বন্ধু।'

ভৈরবফণী হঠাৎ হাঁপাতে শুরু করলেন। সঙ্গে দমকে দমকে কাশি। আমি তাঁর যন্ত্রণা দেখে পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করি। মরবে, তিলে তিলে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে তুমি মরবে শয়তান!...

উল্লাসটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সঞ্জীবদার হাত টেনে একরকম ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সঞ্জীবদা বিস্ময় প্রকাশ করেন, 'তুই হারামজাদা এতো কথা জানলি কৈ থিক্যা ?'

বললাম, 'তার আগে বলো তো, ভৈরবফণীর মেয়েমানুষটা মরলো কি ভাবে ?'

সঞ্জীবদা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'বড় সুন্দর ছিলো দেখতে। একেবারে যারে কয় ছুরি। চাবুকের মতন ফিগার। সরু কোমর, ভারী নিতম্ব আর ডাসা বুক। গায়ের রংটা অদ্ভুত, কেমন যেন মেটে মেটে। ভৈরবফণী ঐ সুন্দরীরে বগলদাবা কইর‍্যা তো দিল্লীতে আইলো। পুঁজি কম থাকলে কি হইবো, ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা ছিলো খুব ধারালো। তার উপর মেয়ে-ছেলেটা খুব সাহায্য করতো ওকে। সামান্য চপ-পিঁয়াজির দোকান দিয়া শুরু...'

সঞ্জীবদা বলছেন, আর আমি দৃশ্যগুলি পর পর যেন দেখতে পাচ্ছি। তিলে তিলে যেমত বা তিলোত্তমা, ভৈরবফণী তাঁর সঙ্গিনীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় ব্যবসায়ে শ্রীলাভ করেছেন। প্রথমে তেলেভাজার দোকান, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেটা রূপান্তরিত হলো একটি ছোট্ট চিনচান রেষ্টুরেন্টে। ফণী নিজে ছিলেন দক্ষ বাবুর্চি,—মানুষের রসনাকে তৃপ্ত করবার আর্ট তাঁর জানা আছে। খদ্দেরদের সামনে চলে-ফেরে বেড়াচ্ছে তাঁর সুন্দরী সঙ্গিনী, মিষ্টি হাসি হেসে তদারকি করছে। ফলে আর দেড় বছরের মধ্যেই হিসেবী ভৈরবফণী ফেঁদে বসলেন 'ভৈরবফণীর হোটেল।'...

এই অব্দি একটা পরিষ্কার ছবি। একটা লোক মই বেয়ে উঠছে—উঠছে। যত উপরে ওঠে, ততই তার লোভের পাহাড় বড় হতে হতে পর্বত হয়ে দাঁড়ায়। অথবা, যতই সে উপরে উঠছে, ততই যুগের বিষাক্ত নিঃশ্বাস এসে পড়ছে তাঁর ওপর। লোভ যেমন আছে, নাফা যেমন আছে, কানুনও তেমনি আছে। আবার কানুন যাদের হাতে ন্যস্ত, তারা যে অনেকক্ষেত্রেই বকরাক্ষস। যেমন, প্রহ্লাদ রাও, পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই ইনকামট্যাক্স অফিসার, প্রতি রবিবার বিপুলবপু স্ত্রী এবং বাল-বাচ্চা নিয়ে ফাইটিং পিকচার্স দেখেন, পান-বিড়ি-মদ—কিছুতেই নেশা নেই। কেবল

বাঁকা নজর্ এবং পড়তি বয়সের জ্বালায় মেয়েমানুষের রসে বড় বশে থাকেন। এই রাও ভৈরবফণীর পিছনে পোষা স্প্যানিয়ালের মতন লেগে আছেন। অথবা, উপমাটা আরো প্রাঞ্জল হয় যদি বলি, প্রহ্লাদ রাও ভৈরবফণীর সবচেয়ে নরম অঙ্গটিতে জোঁকের মতন সেঁটে গেলেন। রিটার্ন তুমি যখন সাবমিট করোনি, বা করলেও প্রচুর কারচুপি আমি দেখতে পাচ্ছি, তখন আমাকে তো বাপু কিছু রিটার্ন দেবেই এবং বিশেষ চুপি চুপি।

রাও রিটার্ন হিসেবে যা চেয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

ভৈরবফণী তখন গদিতে আসীন, বাঘ যেমন মাড়িতে ফিরে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে হাড় চিবোয়। তাঁর পয়সা হয়েছে, আরো হবে, শরীরে কুলোলে কত খাবসুরৎ লেড়কি নিয়ে সে রাত কাবার করতে পারবে। অপরের ফুঁসলে আনা স্ত্রী যতটুকু দেবার, দিয়েছে। এবার সে শেষ অনুদানটুকু দিয়ে যাক।…

প্রহ্লাদ রাওকে রাবেয়ার ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তার ছু' দিন আগে থেকেই রিনোভেসনের নামে হোটেল খালি ক'রে দেওয়া হয়েছিল। রাবেয়া কতটা বাধা দিয়েছিল, জানা যায়নি। মধ্যরাতে প্রহ্লাদ রাও মাতালের মতনই 'সুইট, সুইট…' বলতে বলতে গাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন।

এর পরের ঘটনা মর্মান্তিক এবং বুদ্ধির অগম্য। রাবেয়া ঐ রাতের পর এক অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হলো। মাত্র তিনদিনের মধ্যেই শরীরের চামড়া কুঁচকে গেল, সুন্দর চোখ ছুটো বীভৎস গোলাকার হ'য়ে যেন ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইছে, ভরাট স্তন মিলিয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতর, মুখে কথা নেই, সবসময় একটা খিঁচুনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর,— চেহারার দিকে তাকালে তাকে আর মেয়েমানুষ বলে মনে হয় না। সাধারণ টুকটাক চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা আসলে ওর মৃত্যুকেই ত্বরান্বিত করবার প্রয়াস। প্রহ্লাদ রাও-এর দ্বারা ধর্ষিত হবার এক মাসের মধ্যেই রাবেয়া মারা গেল।

শোনা যায়, যে ঘরটিতে রাবেয়া ধর্ষিত হয়েছিল এবং যেখানে সে মারা যায়, সেই ঘরে রাত কাটানো নাকি বিপজ্জনক। নানা রকম দীর্ঘশ্বাস নাকি অহরহ কানের কাছে বাজতে থাকে। এটা অনেকেই জানে, সঞ্জীবদাও জানেন।

"ব্যবসা ওর পড়তির দিকে", সঞ্জীবদা বললেন, "এখন এশিয়াড চলতেছে, তাই ঘরগুলিতে বোর্ডার, অন্যসময় স্রেফ মাছি ওড়ে,—কে থাকবো শালার ভুতুড়ে হোটেলে।"

তারপরই আমার মুখের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান, "তুই কি কইর‍্যা মেয়েছেলেটারে চিনতি, ক ?"

আমি রহস্যময় গলায় বললাম, "সব আমার ডায়েরীর পাতায় লেখা আছে। ওটা আমার পরবর্তী বই হবে। ছাপা হোক, তখন দুটো কপি তোমায় দিয়ে আসবো।"

"তা তো হইলো, এখন থাকবি কোথায় ? তরে লইয়া খুব মুশকিল হইলো তো।"

আমি হাত নাড়লাম, "কুছ পরোয়া নেই, সঞ্জীবদা। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা তো একটা একসিডেণ্ট। আমি প্লাটফর্মেই রাত কাটাবো। প্লাটফর্মে রাত কাটাতে আমার খুব ভালো লাগে, রোমাঞ্চ অনুভব করি।"

গাড়িগুলি আসে-যায়। ব্যস্ততায় অসংখ্য অপরিচিত মুখ ছোটাছুটি করে। আমি সব কিছুই ঝাপসা দেখছি। এই আবছায়ায় কেবল একটা মুখই জীবন্ত,—ক্যাপ্টেনের মুখ। ওহ্, জীবন! কী বিচিত্র! স্মৃতি থেকে একটার পর একটা পাতা উদ্ধার করতে থাকি।

১

এ অভ্যাসের দাস আমি অনেকদিনের—যখন আর পাঁচটা যুবক-যুবতী চড়িভাতি চড়িভাতি করে, আমি একান্তই নিজের সুখের জন্য ঈশ্বরের বাগানবাড়ি খুঁজি। অদ্বিতীয়া জন্মভূমিতে তেমন বাগানবাড়ির সংখ্যা তো কম নয়, চোখ আর মন থাকলেই হলো। কিন্তু বুকের মধ্যে কাঁটা কালো যুগ, যার দৌলতে পাঁচ টাকা চালের কিলো, 'নেতার' প্রতিশ্রুতি—'পনেরো টাকার বেশী তেলের দাম উঠতে দেবো না', পায়ে হেঁটে অফিস, বিয়ে করিনি বলে বেবিফুড উহ্য···অনন্তশয়ান শিবও এখন গরল উদ্গীরণ করছেন।

ইজ্মাল পরিবারের সদস্য, মাসান্তে নির্দিষ্ট টাকা খসিয়েই খালাস, তবু প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে এই আগুনের আঁচ লাগে, বড় বৌদি দু'বেলা এসে বাজার দর শুনিয়ে যান, এ টাকায় সংসারের চাকা অচল। আমার বিলাস চা, সিগ্রেট, ঘুম। ইদানীং চা খাই কম, স্যাকারিণের পরিমাণ বাড়ছে, মুখের ভেতরটা প্রথমে তেতো, পরে টক টক। সিগ্রেটে টান দিলেই পাঁজর ঝন্ ঝন্ করে, বয়স ত্রিশ। ঘুম আমাকে একদিন তালাক দেবে, যে কারণে মধ্যরাত অব্দি এপাশ ওপাশ। পিল খাই, ফলতঃ দীর্ঘ ঘুম সত্ত্বেও সকাল আটটাতেই মাথার ভেতর একটা বুড়ো লোক ঝিমুতে থাকে। বাসি দিনটার কথা যত ভাবি, মেজাজে ততই খিচ্ ধরে। এই জাতের মেজাজ নিয়েই গতরাতে একটা গপ্প ফাঁদতে বসেছিলাম, ফলশ্রুতি যা হলো, তা কি আর পাতে দেবার! অন্তত বহুল প্রচারিত কাগজের সম্পাদকরা ঐ আর্জি ছাপবেন কেন? যদিচ, গল্পের মতনই সুরটা

বাস্তব, অন্যসবে খানিকটা কল্পনা। সুযোগ যখন পেয়েছি, এ কাহিনীর শুরুতেই সেটা আপনাদের শুনিয়ে রাখি :

'...এক বালতি জল মাথায় ঢেলে হেঁশেলে ঢুকে জানু ভেঙে বসে পড়েছে ভাতের থালার ওপর, সময় নাই—সময় নাই, যদিও এটা ছুটির দিন, সাধারণ ছুটির দিন—র'ববার। র'ববারের কাছে একটা তন্নিষ্ঠ প্রত্যাশা থাকে, গড়িমসি ক'রে সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি কাটিয়ে দেওয়া, সূর্যোদয় দেখার লোভ নাই, অন্ধকার নিয়ে কাব্যি করাও নয়। অথচ এখন, এই র'ববারেও গুবরে পোকার মতন একখণ্ড বাসনা স্পৃশ্যতঃ ধরা পড়েছে,—বড়দিন সংখ্যায় এক চকলেট মলাট পত্রিকায় গল্প লিখবে জীবন বিন্যাসের মৌলিক অসংগতি নিয়ে নয়, প্রত্যাশা অনুযায়ী সিনেমার ধার ঘেঁষা রগরগে রঙিন বুনোট। কিন্তু বুনতে গেলে ভিত্ একটা চাই এবং সেটা খুঁজতে গিয়েই বিপত্তি। আতিশয্য নয়, এরকম এর আগেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে। কাকে নিয়ে গল্প? হাতের কাছেই অফিস, যাকে নিয়ে লিখতে গিয়ে এক প্রচণ্ড জনপ্রিয় লেখক দিব্যি যুক্তি গ্রাহ্য পরম্পরা খুঁজে পেয়েছেন; কিন্তু এ অ-প্রিয় লেখকের কাছে অফিস মানেই এমন একটা জায়গা, যেখানে প্রতিবার কিত্ ক'রে থুতু ছিটাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে একটু একটু নিঃস্ব মনে হয়। খেঁজুর রসের গন্ধ সিঁড়িতে, চেয়ারে-টেবিলে, ফাইল-পত্তরে; লোভে চাখতে চাও, মিষ্টিত্ব পাবে না, জলের স্রোতের মতন কলকলিয়ে শব্দের পর শুধু শব্দ। প্রেতপুরীর ছায়া ঐসব খাটো-লম্বা-রোগা-মোটা দ্বি-পদী জীবাণু। গল্প-সংযোগের সিঁড়ি সেটা এখন নয়।

তার মনে হলো, নিছক অফিসকে নিয়ে কোন কাহিনী হয় না; হলেও আকর্ষণ থাকে না। সত্যি থাকে না। তবে কি অধিকতর পরিণতির জন্য অফিসের কোন বিশেষ চরিত্রকে এনে হাতের তালুতে বসানো উচিত? জবরদস্ত বস্ ভূতনাথ লাহিড়ী?

লাহিড়ীকে নিয়েও গল্প? রামোঃ! মনকে চোখ ঠারা নয়,

লোকটার সর্বাঙ্গে শুধু পয়সা জেতার লোভ। ব্যাটা অনায়াসে মেহেদিবাগানে ওয়াগন ব্রেকারদের সঙ্গে জুয়া খেলতে পারতো। তা সে-রকম কিছুই হলো না, চলতি দুনিয়ায় সবকিছুই এলোমেলো, —দুই আর দুই চার কখনো হবে না, ভূতনাথ লাহিড়ী ওয়াগন ব্রেকার হলো না, একজাতীয় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার হ'য়ে বসলো। হাড়-পিত্তি রি-রি করে, মোটা গোদা হোন্দল কুঁত কুঁত, মুখে পাইপ ঠেসে ঘাড়ে-গর্দ্দানে রামপাঁঠার মতন ফাইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, ইনভ্যালিড চেয়ারে চাপিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলে ওটার জন্য দুঃখ করতে আসবে না কেউ! এমন ভূতকে নিয়ে গপ্প!

রামোঃ!

ঘুমে তৃপ্ত চকচকে মুখ নিয়ে ফ্রেশ মাথায় রগরগে কিছু একটা ফাঁদবার বাসনা সপ্তাহখানেক ধরেই মনের মধ্যে আকুপাকু করছে। এক মুহূর্তও নিজেকে দায়িত্বশূন্য মনে হয় না; এমন কি, একটা বাজার-পচা মেয়েমানুষকে দু'হাতে ছানতেও, ওর উরুর দু'ভাঁজে টোকা মারতে-মারতে ও ভাবনার হাত থেকে সে রেহাই পায়নি; যা কিছু ভেবেছে, সব কিছুকেই মনে হয়েছে খুব বেশী কঠিন বিশ্বাস্য বৃত্ত; অবিশ্বাস্য সরল জলবৎ কাঁচা আখ্যান কিছুতেই কলমের ডগায় এসে হাজির হয় না,—সোজা চটকদার লেখা সে ভুলে যাচ্ছে, লিখতে পারছে না, অথচ, না পারলে গণেশ মার্কা প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব? কামু ইত্যাদিতে চাঁদির চমক নাই; কমলকুমার মজুমদারের নাম ক'জন বাংলার অধ্যাপক উচ্চারণ করেন? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'হাংরাস' কেন বাজার মাৎ করতে পারলো না? অন্তরালবর্তী মগ্ন চৈতন্যকে তাই পায়ের নীচে দাবিয়ে 'সেই ডাক্তার লেখকের মতন পিতা পুত্রকে চেনে না···কন্যা তার মাসির যত্নে লালিত-পালিত, অর্থাৎ সে তার মাকে চেনে না···অথবা, বন্ধুর যুবতী স্ত্রীর ভরাট বুকের ঘ্রাণ নেয় এক যুবক লেখক···অথবা, দিল্লী-কলিকাতা, কলিকাতা-দিল্লী বাছুরে প্রেম···'—ইস্তক সব

বটবৃক্ষের ছায়াযুক্ত ঐতিহ্যকে পরিপুষ্ট করতে হবে, এভাবেই গুছিয়ে নিতে হবে আপখোরাকি।

কিন্তু হবে বললেই তো হয় না, তারজন্য অন্য এলেম্ দরকার। এলেম্ নাই, চৈতন্য খামচি মারে, বিকট যন্ত্রণা, অ্যাপেণ্ডিক্সের মতন বাড়তি প্রত্যঙ্গ হ'য়ে জ্বালাবেই! আসলে ঘুম কখনো নিটোল হয় না, মাথাটাও কখনো ফ্রেশ থাকে না, মুখটাকে চকচকে রাখা আর এক বাহ্যিক সমস্যা—খোঁচা খোঁচা দাড়ি প্রতি দিনান্তে হাসি শানাবে। ধুতি, পাঞ্জাবি, শাল গায়ে চোখে চশমা গলালেই কি ভাবনাটা খোলতাই হয়রে বাপু। হয় না।

হুঁ, তবে কাকে নিয়ে? মিস্টার লাহিড়ীকে বাদ দিয়ে মিসেস্ লাহিড়ীকে নিয়ে কি অশ্বমেধের ঘোড়া হওয়া সম্ভব? কিন্তু—কিন্তু সেই খানদানী মহিলার ইতি-উতি কতটুকুই বা জানা আছে! গত বছর পিকনিক পার্টিতে উপযুপরি তিনবার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, প্রতিবারই সেই একই হাসি, একই জাতের কথাবার্তা। 'চারদিক কেমন দেখছেন?' 'ভারী সুন্দর! আমার কী মজা লাগছে!' 'আমগাছে মুকুল ধরেছে।' 'আমাকে এক থোকা পেড়ে দেবেন?' 'আপনার খোপাটা বিশাল!' 'শুধু কি খোপা?' 'না, না, আরো কিছু কিছু…' 'হি-হি-হি…' 'জানেন তো, মাংসে পোড়া লেগেছে।' 'এমা! আমি জীবনে পোড়া মাংস খাইনি।' 'আজ খেয়ে দেখবেন।…' 'অসম্ভব, আমার ঠেলে বমি আসবে!'

বমি যে কি বস্তু, তার স্বাদ তো তুমি পাওনি দেবী। ব্যাটা ভূতোর সেই ক্ষমতাই হয়তো নাই। থাকতে নিভৃতে আমার কাছে মিনিট কুড়ি, বমি করিয়ে ছাড়তাম।…গায়ের রঙটা চোখ চেয়ে দেখবার বটে, কিন্তু মিসেস্ লাহিড়ীর অন্য সবে কোন অঙ্গীকার নাই। ইয়া এক কাৎলা মাছ, যথা সুকুমার রায়ের হ য র ল ব—বুক কত? বিয়াল্লিশ। কোমর কত? বিয়াল্লিশ। পাছা কত? ঐ একই।

গোলাকার মাংস-পিণ্ড, যাকে কল্পনা ক'রে লেখক অনেকবার ঘুশি কষিয়েছে। যতবারই ঘুষিটা সে ছুড়েছে, হাতটা নির্বিরোধে ফিরে এসেছে, তলপেটে অনুভব করেছে চিন্‌চিনে ব্যথা, দাঁতের ওপর দাঁত গেছে বসে,—না, লাহিড়ী দম্পত্তিকে স্বপ্নেও ঘায়েল করা সম্ভব নয়।

তবে কি বড়বাবুকে নিয়ে? বড়বাবু রামগোপাল চৌধুরী, যার ত্রিকোণ চকচকে টাকের দিকে চেয়ে সূর্যোদয় দেখা সম্ভব, গভীর ভুয়োদর্শনের নামে রাজনীতির মাথা চিবিয়ে খায়, টেবিল চাপড়ে ফাইল গাঁপ ক'রে প্যারালাল ইউনিয়নের স্বার্থ হাসিল করে; একবার টি, বি, হয়েছিল, তারপর হরলিক্সভরা ফ্লাস্ক নিত্যসাথী, অফিসে সকলের সামনে বসে ঢক ঢক ক'রে গিলবে; মক্ষীচুষ, স্টাফ ওয়েল-ফেয়ার ফাণ্ডে তিন বছর এক পয়সা চাঁদা দেয়নি, যদিও ওর যক্ষ্মা—চিকিৎসায় ওয়েল-ফেয়ার কমিটি ছ'শ টাকা খয়রাতি দিয়েছিল; জল-স্থল-অন্তরীক্ষে শুধুই দেখছে পরিবর্তনের সাইক্লোন, আর বালতি বালতি রক্ত···সমাজতন্ত্র আসছে, আসছেই!

এ ব্যাটার মুখেও হাজারটা ঘুষি মারতে ইচ্ছা হয়। টেকো বড়বাবু কোন রগরগে গল্পের উপাদান হতে পারে না; অন্তত চকলেট-মলাট-পত্রিকায় লেখা যায়'না।

তো কাকে নিয়ে?

এই যে আয়নার সামনে হেঁশেল ফেরত স্মৃতি শ্রীমান। ওহ্‌, বাছা, তুমি নিজস্ব কিছু বলবার জন্য পাঁয়তারা কষছো? কাল রাতে বমি হয়েছিল, এখনো উৎকট গন্ধটা যায়নি, ভাত গিলবার সময়ও মুখের ভেতরটা বিস্বাদ, গলার মোটা রগটা তির তির কাঁপে। গিন্নি পুত্র-কন্যা সহ বায়ু-পরিবর্তনে বাপের বাড়ি গিয়েছেন, এই মওকায় আরতিকে আনা হয়েছিল। ডাকলেই আসে আরতি—সেই বাজার-পচা নিছক আরতিকে নিয়ে রতি হয় না, রেস্তরও অভাব, সুতরাং ভক্তসাহার দোকান থেকে সস্তায় বোতল দুই 'বাংলা' আনা

হয়েছিল, শেষ তলানিটুকুও আরতিকে সাক্ষী রেখে সাবাড় করেছিল, তারপরই ওয়াক্‌…ওয়াক্‌…ওয়াক্‌… ! জন্মদিনের পোশাক পরে এ নাইট উইথ অ্যারোটি প্রুফড্‌ ফেইলিওর। বিপরীতে হিত। না হলে, আবার সেই অস্বাভাবিক নিয়মের পায়ে নাকে খত্‌ দিতে হতো— এ বেলা চারলাখ, ওবেলা চারলাখ, পেনিসিলিনের পায়ে দণ্ডবৎ।

তা হলে কি এই মরদকে নিয়েই গল্প ফাঁদা হবে? কি লাভ! অমন অজস্র লেখা 'আধুনিক'দের অহংসর্বস্ব কলম থেকে প্রচুর—প্রচুর উৎসারিত! বড়দিনে আবার সেই বাসি ময়লা ঘাটানো।

না, তা হয় না।

রেগে-মেগে নিজের গালে থাপ্পড় মারতে গেল সে।

যথারীতি পারলো না। এবারেও হাতটা নির্বিরোধ।

কে যেন্ হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে।

কে হাসে?

কেউ না। অথচ, ঐ হাসিটা সত্যি। আর এ হাসিটা আছে বলেই তার মাথায় রক্ত চড়ে যায় এবং সে লিখতে বসবেই। এটা ঠিক লেখা নয়, প্রতিশোধ।'

এ পর্যন্ত লেখা। গল্প নয় নিশ্চয়। যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির সামনের আতাগাছে কিছু অদৃশ্য পাখির পাখা ঝটপটানি ছিল; লেখা যখন শেষ হলো, আতাগাছ শুধু নিঃশব্দ নয়, ভৌতিক। উপকার আমার কিছু হয়েছে বৈকি,—কেউ ছাপুক না ছাপুক, হাতের নিস্-পিসানি কমেছে।…

যাক, যে কথা দিয়ে শুরু অর্থাৎ চড়িভাতি চড়িভাতি এবং ঈশ্বরের বাগানবাড়ি। চড়িভাতির প্রসঙ্গ উঠেছিল কাল রাত আটটায়, যখন আমার শ্যামলা বোন টুনু, যাকে আমি প্রায়শই ইস্টকুটুম পাখি বলে ডাকি, আমার ঘরে কলমদানি থেকে একটা পেন তুলে নিতে নিতে ভারিক্কি গলায় বলেছিল, 'কলেজ থেকে ম্যাসেঞ্জার যাচ্ছি।'

প্রবোধ সান্যালের বিতর্কিত ধারাবাহিক 'বনস্পতির বৈঠক' থেকে চোখ তুলি, 'বেড়াতে যাচ্ছিস ?'

'বেড়াতে নয়, চড়িভাতি।'

'চড়িভাতি করতে অতদূর কেন ?'

'আমাদের কলেজের ব্যাপার-স্যাপার অমন রাজসিকই হয়।'

অতঃপর কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে ফস্ ক'রে বলে উঠি, 'আমিও যাচ্ছি বেড়াতে।'

টুনুর চোখ দুটো বড় বড় হয়, 'মাইরি ?'

'আমি দিব্যি কাটি না।'

'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'বললে তো চমকে উঠবি।'

'বল না!'

'ঈশ্বরের বাগানবাড়ি।'

'ইয়ার্কি মারিস না। যত সব উদ্ভট কথাবার্তা।'

ঠোঁট উল্টে চলে গেছে টুনু। কিন্তু ইয়ার্কি আমি মারিনি। এ অভ্যাসের দাস আমি অনেকদিনের—যখন আর পাঁচটা যুবক-যুবতী চড়িভাতি চড়িভাতি করে, আমি একান্তই নিজের সুখের জন্য ঈশ্বরের বাগানবাড়ি খুঁজি। টুনুরা ম্যাসেঞ্জার যাচ্ছে, যাক। আমি বেড়িয়ে পড়বো ঈশ্বরের বাগানবাড়ি খুঁজতে।...

তখন রাতের বয়স বেশী নয়, যদিও হিমেল প্রভাবে মধ্যরাত্রির তন্ময়তা। আশে-পাশে ঝোপ-ঝাড় নাই, অথচ যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, ডালটনগঞ্জ থেকে মাইল পনেরো দূরের বেথলার সংরক্ষিত বনভূমির কথা মনে করিয়ে দেয়; সদর রাস্তায় হেভী ভিয়েকেলের আনাগোনা নিশ্চয় লেগে আছে, কিন্তু এখানে সেই আওয়াজ সুম্ সাম্ নির্জনতা বৈ কিছু নয়।

যাবো কোথায় ?

কোথায় পাবো ঈশ্বরের বাগানবাড়ি ?

ভ্রমণলিপ্সুরা যে সব জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে, যথা কাশ্মীর, হরিদ্বার, ওয়ালটেয়ার, বিবেকানন্দ শিলা···আমাকে আদৌ টানে না। আমি বাগানবাড়ি খুঁজি এমন সব জায়গায়, যাদের কুমারী-সলজ্জতা এখনো কাটেনি, ঈশ্বরের যে বাগানে প্যারামাউণ্ট মানুষের দাপাদাপি এখনো তুঙ্গে ওঠে নি।

অবশ্য অসুবিধা ষোলো আনার উপর আঠারো আনা। ঐ সব জায়গার ভূগোল আমার অজানা এবং প্রেমাঙ্কুর অতর্থীর মতন যাযাবর নই। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে যে জাতের মানুষ, আমি তা নই। একদা 'মানসী মানা'র লেখক প্রাণেশ চক্রবর্তী তাঁর দুঃসাহসিক পর্বত অভিযানের গল্প শুনিয়েছিলেন; শুনে আমার কল্পনা বিস্তারিত হয়েছে, কিন্তু স্বয়ং-সক্রিয় হবার কথা চিন্তাও করতে পারি না। কল্পনাতে তো প্রায়ই দূরে অনেক দূরে পাড়ি জমাই, এবং আমার সাম্প্রতিক ধারণা, বুদ্ধিমান লোকেরা বাস্তবের চেয়ে কল্পজগতেই বেশী বিচরণ করে থাকেন। তবু, মুশকিল হলো, এই কল্পনারও একটা সীমা আছে, বিশেষত এই কল্লোলিনী কলকাতার একটা ছোট্ট ঘরে শুয়ে শুয়ে। একটু পরেই ক্লান্তি আসে, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়, কোন উপসংহার টানতে পারি না।···

উপসংহার টানতে না পারার যন্ত্রনায় গত রাতটা কাটিয়ে আজ অনেক বেলায় সূর্যের মুখ দেখেছি। পায়খানা বাথরুম ইত্যাদি সারতে সারতেই অফিসের বেলা, মিনিট পনেরো চুল ও পোশাকের পিছনে ব্যয় করে সরাসরি কিচেনে। ভাতের থালার দিকে চোখ রেখে আমি যেন অনেকটা ভূমিদাস, দাসসুলভ গলাতেই বলি, 'বৌদি'

ময়লা শাড়ি পরা বৌদি রান্না ঘরেই দাঁড়িয়ে, সাড়া দিলেন, 'বলো।'

'টুনু তো ম্যাসেঞ্জার যাচ্ছে।'

'কালই ফিরবে।'

'জানি।'

'তোমার কি আপত্তি আছে?'

'আপত্তি কেন থাকবে, কলেজ থেকে মেয়েরা যাচ্ছে—

'তবে?'

'আমিও এক জায়গায় যাবো বলে ঠিক করেছি।'

'বায়ু পরিবর্তন?'

'মন পরিবর্তনও বলতে পারো।'

'বাঃ! সংসার যখন করোনি, তখন তো আর পিছুটান নাই; যখন ইচ্ছা, পাখা মেললেই হলো।'—বৌদি হয়তো সরল ভাবেই বললেন, কিন্তু আমি যেন ঈষৎ ঝাঁজের স্বাদ পাচ্ছি। সাত বছরের বিবাহিত জীবনে বার তিনেক বাপের বাড়ি যাওয়া ছাড়া তার আর কোন বায়ুপরিবর্তনের অভিজ্ঞতা নাই। অথচ, দাদা রেলের চাকুরে, পাশ পিটিও সবই পান।

আঙ্গুলের ডগায় লালচে মোটা ভাত নাড়তে নাড়তে নীচু গলায় বলি, 'এখনো জায়গা ঠিক করিনি।'

'সেটা আবার প্রবলেম্ নাকি? রেস্ত যদি থাকে, ছুনিয়াটা তো তোমার পাঁচ আঙ্গুলে!'

এ মন্তব্যে চমক লাগে। যেন সপাং করে মুখে এসে পড়ে। বৌদি বাংলায় অনার্স, এককালে নাকি মেয়েদের কাগজে কবিতা লিখতেন; এখনো আচমকা এমন সমস্ত কথা বলে ফেলেন, যাকে প্রায় কবিতা বলে মনে হয়। কথাটা সত্যি আমার মনে ধরেছে— 'রেস্ত যদি থাকে, ছুনিয়াটা তো তোমার পাঁচ আঙ্গুলে।'...

অফিসে গিয়ে কাজ-কম্মে মন নাই, পঞ্চাশটা বিল এন্ট্রি করতে গিয়েই বিরক্ত, ইচ্ছা হয় নিজের ছ'গালে ছুই থাপ্পড় কশিয়ে দি। ছুটা বাজতেই সহকর্মী বলাইয়ের ওপর দায়িত্ব দিয়ে রেকর্ড রুমে ঢুকি। সেখানে কিন্তু লেজারের পাতায় নিজের এ্যাকাউন্ট দেখে

রীতিমত পরিতৃপ্ত—শ' পাঁচেক জমেছে! হাজার টাকার এফ্-ডি-আর একখানা ছিল, যার থেকে সুদ পাবো সত্তর টাকা, পকেটে আছে গোটা ষাটেক। সংখ্যাগুলি যোগ করি, আর আমার বুক ফুলে ওঠে, নিজেকে সম্ভ্রম করতে ইচ্ছা হয়। আমার পকেটে এতগুলি টাকা! আর আমি কিনা তেল-ডাল চালের কথা ভাবছিলাম।'...

বেলা তিনটের মধ্যে এক পকেট টাকা নিয়ে আমি বেলেঘাটা মেইন রোডে, সুশোভনের বাড়িতে। বাতাসে তেল-কালির গন্ধ, এ বাড়ির দরজায় দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই মাথার ভেতরটা ঝিম্ ঝিম্। চোখে মাইনাস্ পাওয়ার চশমা টকটকে ফর্সা সুশোভন ঘোষ চৌধুরী বয়সে হয়তো আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ই হবে, এক কালে নামী ও দামী দৈনিকের সাংবাদিক ছিল, হালে সেই অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে স্বয়ং এক পাক্ষিক কাগজ করেছে, নাম বড় বিচিত্র —'সাধ ও সাধ্য।' প্রথম সংখ্যা থেকেই 'সাধ ও সাধ্য' অনায়াসে নি-খরচায় আমার লেখা পাচ্ছে। বাড়িতেই প্রেস ও অফিস, অহরহ একটা ঘটাং ঘট্ ঘটাং ঘট আওয়াজ, বাতাসে তেল-কালির গন্ধ, মাথার ভেতরটা ঝিম্ ঝিম্ করবেই। সুশোভনের কথা বাদ দিচ্ছি কিন্তু সুশোভনের বৌ রেবা যে কি করে এক জোড়া কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস করছে, সেটাই আশ্চর্য।

দরজা খুললো রেবাই, পানের বাটার মতন মুখ, চেহারায় গিন্নী গিন্নী ভাব।

দরজা খুলতেই জিজ্ঞেস করলুম, 'কি, ভালো আছো?'

রেবা কল কলিয়ে ওঠে, 'উঃ, কদ্দিন বাদে। আর আসেন না কেন?'

'সুশোভন আর আসতে বলে না, তাই।'

'ওর কথা বাদ দিন, সব সময় কালি-ঝুলি মেখে ভূত হয়ে আছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, 'সাধ ও সাধ্য'র চেম্বারে উঁকি মারতেই চাক্ষুষ

প্রমাণ পেলাম। মেশিনের সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে আছে সুশোভন, পরণে হাফ প্যান্ট, হাফ-শার্ট, লোমশ হাত পায়ে কালি-ঝুলি, স্বয়ং কম্পোজ করছে। আমাকে দেখে এতটুকু অপ্রস্তুত নয়, চকিতে উঠে দাঁড়ায়, তার সাদা দাঁত ঝিলিক মারে, 'আয়, আয়। নতুন টাইপ আনিয়েছি। নিজেই কম্পোজ করছিলাম।'

আমি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসি। রেবা আধ মিনিট উস-খুস ক'রে সম্ভবত স্টোভ ধরাতে যায়, বাঙ্গালী গৃহিনীর এই ব্যস্ততাটুকু আমার পরিচিত।

'তোর কাগজ কেমন চলছে?'

সুশোভন যেন একটু থতমত খায়, 'গ্রাহক বা বিজ্ঞাপন তো কম পাচ্ছি না। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'তা হলে তো তোদের জনপ্রিয় সরকারকে নতুন ক'রে অপদার্থ বলতে হয়। নিউজ প্রিণ্টের বিকট সমস্যা, নিত্য বিদ্যুৎ-বিভ্রাট। এই নৈরাজ্যে ক'দিন কাগজটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, সন্দেহ আছে। অনেক আশা নিয়ে নেমেছিলাম।'

সুশোভনের দীর্ঘশ্বাস। আমি নির্বিকারভাবে কান পেতে শুনলাম। কথাগুলি নেহাতই চর্বিত চর্বন, হাটে-বাজারে সর্বত্রই ঐ একই হাহাশ্বাস।...সে আমার মুখোমুখি টেবিলের অপরধারে আর একখানা চেয়ার নিয়ে বসেছে। চশমার ভেতর একজোড়া উজ্জল চোখ, বলিরেখার আঁচড়গুলি স্পষ্ট। ওঠা-নামায় উৎকট শব্দ, দুই প্রেস-ম্যান দর দর ঘামছে, এই শীতেও বুক-পোড়ানো তাত, নিথর সিলিংফ্যানটা হলুদ কাগজে মোড়া।

সুশোভন জিজ্ঞেস করে, 'সরাসরি অফিস থেকে আসছিস?'

'হুঁ।'

'কোন নতুন লেখা দিবি?'

আমি প্রায় মরীয়া হ'য়ে বলি, 'না, আমি সে জন্য আসিনি।

তোর কাছে একটা সাজেসান চাইছি।' সুশোভনের ভুরু চশমার ফ্রেম ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে, 'কিসের সাজেসান ?'

পেপার-ওয়েটটা হাতের তালুতে বসিয়ে বলি, 'কিছুদিনের জন্য ক'লকাতা থেকে ডুব দিতে চাই।

'হঠাৎ ? বাড়িতে বুঝি বিয়ের তোড়জোড় চলছে ?'

জিভ্ কেটে বলি, 'মাথা খারাপ। বড় এক ঘেয়ে লাগছে, তাই।'

'কোথায় যাবি ?'

'সেটাই তো ঠিক করতে এলাম।'

চা-এর কাপ সাজিয়ে রেবা ঘরে ঢোকে, মিষ্টি হেসে বলে, 'কিছু মনে করবেন না, শুধু চা দিচ্ছি।' আমি সাদামুখে নাটকীয় গলায় স্তুতি জানাই, 'তোমার হাতে চা খাবার জন্য এ যুগের দেবতারা আর একবার সমুদ্র মন্থন করতে রাজি আছে।'

রেবার মুখ ঈষৎ পাংশু হয়, 'চুমুক দিলে আর অত প্রসংশা করবেন না। খাঁটি চিনির চা নয়, আধখানা স্যাকারিনের ট্যাবলেট দিতে হয়েছে।

এরও জবাবে উজ্জ্বল হাস্যে কিছু একটা বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার আগেই সুশোভন-রেবার দ্বিতীয় পুত্রের ঘুম ভাঙ্গা চিৎকার শোনা যায়, বিব্রত রেবা এক রকম ছুটে পালায়।

সদ্য বিবাহিত সুশোভন ও রেবাকে মনে আছে। এখনো মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভাসে। হৈ-হৈ করে নামা বৃষ্টিতে তারা ছুটিতে সংগোপনে ভিজছে। একজোড়া টাটকা দম্পত্তি খুব চেষ্টা করে, পরিচিত-অপরিচিত সকলের কাছ থেকে নিজেদের রোমাঞ্চকে লুকিয়ে রাখতে। তবু ধরা পড়ে। পরিচিত ও পরিজনের লুব্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে,—সুশোভনের মুখে পাউডার, সিল্কের পাঞ্জাবীতে সিঁদুরের হাল্কা প্রলেপ, বোতামে জড়িয়ে আছে একগাছা লম্বা চুল ; আর রেবা তো প্রায়ই নতমুখী বধূ, বাড়িতে বহুদিন লাল চেলী পরে রীতিমত অহংকারী !...

'বাংলার বাইরে যাবি ?'

—কিছুক্ষণ বিরতির পর সুশোভনই কথা শুরু করে।

'ভালো স্পট সাজেস্ট করতে পারলে, এনি হোয়ার ইন ইণ্ডিয়া।'

'ব্যাঙ্গালোর গেছিস ?'

'দু'বার।'

'জব্বলপুর ?'

'একবার।'

'চুনার ?'

'গত বছর গিয়েছিলাম।'

'আগ্রা ?'

এবার ধৈর্য হারিয়ে প্রায় ধমকে উঠি, 'বাদ দে ; ওরকম হাজারটা বিখ্যাত জায়গার নাম আমি পর পর বলে যেতে পারি। কোন বিচিত্র অজানা জায়গার নাম কর। এমন জায়গা, সাধারণ ভ্রমণ-কারীরা যেখানে ভিড় করে না, অথচ দেখবার অনেক কিছুই আছে। সাংবাদিকতার ঝোলা নিয়ে চক্কর লাগিয়েছিস তো কম নয়।'

একটানা বলি, গলায় অধৈর্য ও আবেগ দুই-ই ছিল। সুশোভন গালে হাত বোলায়। হঠাৎ দেখি, আলো নাই, প্রেসের ঘটাং ঘট বন্ধ। সেই অভ্যস্ত পরিবেশ—ক্ষণে ক্ষণে বৈদ্যুতিক বিপর্যয়। কিছুক্ষণ ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ক্রমশ সুশোভনের মুখের ভগ্নাংশ পরিস্ফুট্ হয়, কতগুলি রেখার সমষ্টি। সে ভাবছে। নিশ্চয় অনেকগুলি স্থানও তাদের স্মৃতি ধিক ধিক করছে তার মনের পর্দায়। তারপর আচমকা সেই আবছা আলো-অন্ধকারে যেন তার নির্দেশ ভেসে আসে।

'পোর্টব্লেয়ার যা।'

'আন্দামান ?'

'পোর্টব্লেয়ার তো আন্দামানেই। আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু

রামশঙ্কর চক্রবর্তী থাকে ওখানে। আমার চিঠি নিয়ে যাবি, কোন অসুবিধা হবে না।'

আমি কিন্তু যথার্থ খুশি হতে পারি না, 'আন্দামানের কোন কোন জায়গা এখনো আদিম থাকলেও পোর্টব্লেয়ার শুনেছি ভোল বদলে বিলকুল আধুনিক। ভালো লাগবে কি?'

সুশোভনের স্বরে এবার বিরক্তি, 'হঠাৎ তুই এতো বুনো হয়ে উঠলি কবে? পোর্টব্লেয়ার ভালো না লাগলে জম্বুদ্বীপে যাবি। মানুষ-জনের টিকিটি নাই। রবীনসন ক্রুশো হয়ে সমুদ্রের ধারে বসে থাকতে পারিস।'

সুশোভন বাগুক, তার বর্ণনায় কিন্তু যথেষ্ট রোমাঞ্চ। আমার বুকের রক্ত ছলকে ওঠে। সমুদ্র-যাত্রা এ নসীবে এ যাবৎ হয় নাই। মুহূর্তে আমার ডান হাতের পাঁচ আঙ্গুল দৃঢ় হয়। আমি ঈশ্বরের বাগানবাড়ির হদিশ পেয়ে গেছি।...

২

প্রিয় রামশঙ্কর,

আশা করি, সুদূরে তুই বহাল তবিয়ত।

এই চিঠি নিয়ে যে যাচ্ছে, সে আমার বন্ধু ; শুধু বন্ধু নয়, খুব আপনজন। হয়তো ওর নামের সঙ্গেও তোর পরিচয় থাকতে পারে,—শেখর সেনগুপ্ত, খান আষ্টেক বই লিখে ফেলেছে এবং গোপন বাসনা, প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যায় ও একদিন এদেশে রেকর্ড করবে। যদিও ও গল্প লেখে বিপ্লব নিয়ে, ভূত নিয়ে ও কাম নিয়ে, মানুষ কিন্তু খুবই ঠাণ্ডা, রাগে কদাচিৎ, মনের মতন সঙ্গী পেলে ভীষণ কথা বলে। সম্প্রতি এমন যে রংদার শহর ক'লকাতা, তাও তার ভালো লাগছে না! সুহৃদ আমার বাণপ্রস্থে যাচ্ছে আন্দামানে। তুই ওকে একটু দেখিস।

আমার কথা আর কি জানাবো?

চৌত্রিশে পা দিয়ে আর সংশয় থাকে না,—আমার মতন ব্যর্থ ও অপদার্থ পুরুষ আর হয় না। চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিলাম যে মানসিক বল নিয়ে, এখন তা কর্পূরের মতন উবে যাচ্ছে।

দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেও বাঁকা পথে চলতে জানিনে; নিউজপ্রিন্টের অভাবে, জনাকয়েক শিল্পপতির বিরোধিতায়, আনুষঙ্গিক আরো বহু অকপট যন্ত্রণায় আমার

ছোট স্বাধীন কাগজের নাভিশ্বাস উঠেছে। বড় আশঙ্কা হয়, রেবা তার দুই শিশু-পুত্রের হাত ধরে পথে এসে না দাঁড়ায়।

ভালোবাসা নিস। ইতি—

তোর

সুশোভন।

সুশোভনের লেখা এই চিঠি যেন আমার রক্ষাকবচ, খুব সতর্কতায় কোটের বুক-পকেটে রেখেছি ; এখন ডেকে দাঁড়িয়ে আর একবার চোখ বুলিয়ে নি। চিঠিখানার মধ্যে গোত্র-মহিমায় সুশোভন জীবন্ত। ঐ একটা মাত্র মানুষ, যার বুকের মধ্যে আমি একখানা আস্ত স্বর্ণখনি আবিষ্কার করেছি। সুশোভনের চাকুরি ছাড়ার ইতিহাস বিচিত্র। ও যে কাগজে কাজ করতো, তার মালিকের এক অভিনব ফতোয়া এসেছিল সেবার প্রাক-পুজোয়, "আমার কাগজে যাঁরা লিখবেন বা এই কাগজের হয়ে যাঁরা কাজ করবেন, আর কোন পত্র-পত্রিকার পুজো সংখ্যায় তাঁরা লিখতে পারবেন না বা নিজেদের কোন ভাবেই যুক্ত রাখতে পারবেন না।" আশ্চর্যের কথা, বাংলাভাষার কলম-বীররা নির্দ্বিধায় সেই দাসত্ব পত্রে মুচলেকা দিলেন। দিলো না শুধু সুশোভন। নিরুদ্বিগ্ন মনের স্বাস্থ্যে কাগজের অফিসে আর ফিরে গেল না।···

ক'লকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ারের দূরত্ব প্রায় আটশ' মাইল। ডালহৌসির ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে ঢুঁ মারার দরকার হয়নি। যে মুহূর্তে জেটি-ত্যাগী এম, এস, আন্দামান সাইরেনে কম্পন তুলেছে, আমি যেন যথার্থই সী-ম্যানটি হয়ে কেবিন ছেড়ে এঞ্জিনের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি। টের পাচ্ছি, ক'লকাতা-বাসের শ্যাওলাগুলি খসে খসে পড়ছে শরীর থেকে। জল—জল, সামনে-পিছনে অবিরাম জল।

অফিসের এক বন্ধু উপদেশ দিয়েছিল, 'জাহাজে না গিয়ে প্লেনে

যা। পোর্টব্লেয়ারগামী ভাইকাউন্টে চাপবি, ভায়া রেঙ্গুন পোর্টব্লেয়ার পৌঁছবি। জাহাজে চাপা ঝকমারি, সময়েরও অপব্যয়।'

আমি হেসে বলেছি, 'আমি তো ঐ ঝকমারির লোভেই যাচ্ছি; আর হাতেও অঢেল সময়। দু'চোখ ভরে সমুদ্র দেখবো।'

দু'চোখ ভরে সমুদ্র দেখা!

আক্ষেপ নাই।...সাগর দ্বীপ পার হতেই মালুম হলো, বে অফ্ বেঙ্গল কাকে বলে! প্রবল প্রচণ্ড সফেদ ঢেউয়ের ফণা বার বার ছোবল মারে, যদিও বাতাসের দাপট তেমন নাই। সার সার নরনারী রেলিঙে ঝুঁকে সমুদ্রের প্রতি তাদের আবেগ ও ভালোবাসাকে জানায়। যারা বিমানে না চেপে জাহাজে চলেছে, এই মুহূর্তে তাদের আমার সহমর্মী বলে মনে হয়। একটি ছোট মেয়ে ডেকের এক কোন থেকে অন্য কোন অব্দি ছুটে বেড়াচ্ছে ও হাততালি দিচ্ছে। ওর বাবা লম্বা থাবা বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে, চট ক'রে পারে না। খিল খিল হাসি।

'খুব ফুর্তি হয়েছে আপনার মেয়ের।'

'আর বলবেন না। ভীষণ দুরন্ত!'

বছর পঞ্চাশের এক প্রৌঢ় হু-হু ক'রে শীতে কাঁপছেন। আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

'ঠাণ্ডা লাগাবেন না, গরম জামা বা চাদর পরে দাঁড়ান।'

'আমার হয়েছে খুব মুশকিল মশাই! ট্রাঙ্কের চাবিটা কোথায় যে হারিয়ে ফেলেছি! তালা ভাঙবারও ক্ষমতা নাই।'

'যদি বলেন, আমি সাহায্য করতে পারি।'

'তা হলে বড় উপকার হয়, আসুন আমার ঘরে।'

খুব একটা পোক্ত তালা নয়। আমার মতন অনভিজ্ঞ লোকও তার জোড় খুলে দেয়। এদিক-ওদিক খুঁজে পেতে একটা শিক পাওয়া গিয়েছিল, ওটার সাহায্যেই কাজ হাসিল। ট্রাঙ্ক খুলতেই প্রথমে যেটা নজরে আসে, সেটা এক বিশাল কাশিদাসী মহাভারত।

কানায় কানায় শ্রদ্ধা নিয়ে প্রৌঢ় সেটি নিজের কপালে ছোঁয়ালেন। হয়তো আমার কপালেও ঠেকাতে চেয়েছিলেন, আমি চকিতে সরে দাঁড়াই।···

জাহাজ কাঁপছে। যত কাঁপে, তত গতি বাড়ে। জোরে! আরো জোরে! পিছনে ফেলে আসা বন্দরের আলো আর দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। জাহাজীরা মন্থরগতিতে ডেকের ওপর হাঁটা-চলা করে, দড়ি-দড়া গুছিয়ে রাখে। ঐ সব হাসিলের সাহায্যেই বন্দরে জাহাজকে বেঁধে রাখা হয়। সূর্য বহুক্ষণ অস্ত গেছে, কিন্তু সমুদ্রের বুক থেকে এখনো আলোর শেষ রেশটুকু মুছে যায় নি। আবছা আলো, আবছা অন্ধকার। আমি সর্বহারা ডেক-যাত্রীদেরই একজন। হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে শুয়ে থাকা চাল-চুলোহীন নাগরিকদের মতন; সারা রাত শীতে কাঁপবো এবং শ্রান্তিহীন চোখে সমুদ্র দেখবো।

কখনো কখনো অবশ্য সদ্য-পরিচিত যাত্রীদের কেবিনে আমি প্রবেশের অনুমতি পাই, তাদের পোর্টহোল দিয়ে উঁকি মারি,— সমুদ্রের রঙ বদলায়; এখন কালো, শ্লেটের মতন কালো।···ক্রমশ দিন পেরিয়ে রাত আসে, রাত পেরিয়ে দিন। এবং সময়ের সঙ্গে তাল ঠুকে ঐ সমুদ্র বহুরূপী—কখনো নীল, কখনো লাল, কখনো জরদা, কখনো নিকষ অন্ধকার। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় গর্জনরত সামুদ্রিক চিড়িয়া অথবা, ডালফিনের ঝাঁক। বিশ্বাস জন্মে, আমি বোধহয় আর কোনদিন মাটিতে পা রাখবো না, এই জাহাজী সৌরভে আমি আর কোনদিন কলকাতার জনারণ্যে হারিয়ে যাবো না।

নাবিকদের উৎসাহ লক্ষণীয়। জনা কয়েক পূর্ববঙ্গীয় ভাটিয়ালী ধরেছে, ঠিক সমুদ্র-বন্দনা নয়, নদী-প্রশস্তি। বাতাসের গোঙানিতে সেই মিলিত স্বর অনেক পাতলা। প্রতিটি পোর্টহোল খুলে দেওয়া হয়েছে। মধ্য সমুদ্র বলেই শীতের কামড় ততটা তীব্র নয়; না হলে

আমাকে হয়তো দুমড়ে-মুচড়ে ডেকের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিতে হতো। আজ রবিবার। জাহাজীরা এই দিনটাকে উৎসবের দিন মনে করে।

ক্যাপ্টেন বীরভূষণ আয়েঙ্গারের চেহারাখানা চমকে দেবার, নিগ্রো নিগ্রো টাইপ, চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু—বীরভূষণকে ভারতীয় বলে সনাক্ত করা কষ্ট; মনে হয়, আফ্রিকা থেকে ধরে আনা কোন হাপসী—ক্রীতদাস। ক্রীতদাস নয়, ক্রীতদাসদের প্রভু। চক্ষু রক্তাভ, মুখে বিশাল পাইপ। ডেকে একটা ইজমালি পারদ-চটা আয়না আছে, মাঝে মাঝে সেটার সামনে দাঁড়ান এবং প্রতিবার নিজের প্রতিবিম্বকে উদ্দেশ্য ক'রে মুচকি হাসেন।

'কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার—এ পথে আপনি বোধহয় প্রথম।'

—আচমকা আমাকে এই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে বিস্মিত করেছিলেন আয়েঙ্গার। আমি ঠোঁটে কৌতুক দেখছি, পাইপের মুখটা যেন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।

'কি ভাবে আন্দাজ করলেন?'

—বিস্ময় ঝেড়ে হেসে জিজ্ঞেস করি।

'যে রকম এক দৃষ্টিতে সমুদ্রকে গিলছেন।'

'জীবনে এই প্রথম সমুদ্র দর্শন তো!'

ক্যাপ্টেন হো হো করে হেসে উঠলেন, 'আমি আমার জীবনে পাহাড় ও সমুদ্র—দুটোই প্রচুর দেখেছি, দেখছি। পাহাড় কখনো পুরনো হয় না, কিন্তু সমুদ্র ক্লান্ত করে। আমাদের এখন ভালো লাগে মাটি, পাথর ও মানুষ!'—বলেই ফিক্ ক'রে হাসলেন ক্যাপ্টেন, এক চোখ টিপে নীচুস্বরে বললেন, 'মানুষ হয়, মেয়েমানুষ।'

এই রসিকতার জবাব দিতে যাবো, তাঁর আগেই ক্যাপ্টেন বীরভূষণ আয়েঙ্গার ফরোয়ার্ড ডেকে গিয়ে দাঁড়ালেন, সেখানে ঝুঁকে দু' নম্বর মাস্টের নীচে উইনচ্ মেশিনের লিভার পরীক্ষা করতে থাকেন।

ক্যাপ্টেন বীরভূষণ আয়েঙ্গার সম্পর্কে আরো কিছু জানা গেল আর এক জাহাজী সারেঙ মানব দত্তর কাছে। ঢিমসে শরীর, হাত-পা ও কপালের রগগুলি ফুলে আছে, একমাথা চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের মণি দুটি গোল গোল, ফর্সা রঙ তামাটে। দত্তর দোষ, হড়বড় হড়বড় ক'রে কথা কয়, উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং মুখ থেকে প্রচুর থুতু কুয়াশাব মতন বাতাসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়।

'আপনাদের ক্যাপ্টেনকে ভারতীয় বলেই মনে হয় না।'

'ঠিক ধরেছেন, আপনার চোখ আছে। উনি খাঁটি ভারতীয় নন। রক্তে ভেজাল আছে।'

'সে কি মশাই!'

'বলছি, বলছি। ওর বাপের নিগ্রো বউ ছিল।'

'নিগ্রো বউ! এমন কথা—'

'এই প্রথম শুনলেন, তাই তো? জীবনে অনেক কিছুই তো প্রথম শুনবেন, প্রথম দেখবেন। মানুষের অভিজ্ঞতার কি শেষ আছে! এককালে আমি সুপারির কারবার করতুম, জাহাজের মাস্তুল অব্দি দেখিনি। আর এখন তো দেখছেন, জাহাজের মাস্তুলের উপর বসে আছি।'

'হুঁ, তা তো বটেই। ক্যাপ্টেনের কথা বলুন।'

'বলছি। বীরভূষণের বাপ পদ্মভূষণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। সোমালিল্যাণ্ডের এক বাস্তুতো যুবতীর যৌবনে মজলেন। তাঁদেরই ছেলে বটেন তো আমাদের ক্যাপ্টেন!'

দত্ত একটু থামে, কি যেন ভাবে; তারপর আবার বলে, 'চেহারা দেখে আপনি হয়তো মানুষটাকে ঠিক ঠিক চিনতে পারবেন না। ওঁর একটা মস্ত বড় গুণ হলো, খুব ফ্রাঙ্ক। মুখে এক কথা, পেটে আর এক—এমন জাতের মানুষ নন। মুডে থাকলে আমাদের জড়ো ক'রে নৌ-যুদ্ধের গপ্প করেন।

'উনি কি আগে নেভীতে ছিলেন?'

'আরে বাস! আপনি দেখছি স্যার গুণী লোক, চট করে ধরতে পারেন!'

দত্ত আমার হাত চেপে ধরে। আমি বিব্রত স্বরে বলি, 'এ আর ধরতে পারার কি আছে—'

'আছে, আছে। অনেকের সঙ্গে কথা বলতে জিভ ব্যথা হ'য়ে যায়, তবু শালারা ধরতে পারে না, কি বলতে চাইছি। ঐ আমার সঙ্গে বসে হাসিল গুটায় সুকানী আনিসুদ্দীন,—ব্যাটা গো-মুখ্যো, ডাইনে বললে বা বোঝে, বা বললে ডাইন।'

'যাক আপনাদের ক্যাপ্টেনের কথা বলুন।'

'আপনি দেখছি, ক্যাপ্টেন সম্পর্কে খুব উৎসাহী। আমরা সব কমন সী-ম্যানরা বুঝি মানুষ নই?'

—মিটি মিটি হাসতে থাকে মানব দত্ত।

আমি বলি, 'আরে না, না, তা হবে কেন? আপনাদের সঙ্গে সহজে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়। ক্যাপ্টেন ট্যাপ্টেনদের সঙ্গে কথা বলতেই ভয় হয়।'

প্রায় ধমকে ওঠে দত্ত, 'দূর মশাই। আপনি একজন যাত্রী, আপনার আবার ভয় কিসের? ভয় পাবো আমরা, কারণ আমাদের বস ঐ ক্যাপ্টেন। তা ছাড়া, দুনিয়ার সব ক্যাপ্টেনদেরই চরিত্র বোধহয় এক। জাহাজের কলকব্জাগুলির মর্ম বোঝেন; খুব মাল খেয়েও বেতাল হন না। বন্দরে নেমে 'জেনানা-মহলে' যান, সী-ম্যানদের রেঁস্তরায় ফুর্তি করেন, কিন্তু জাহাজে একেবারে খাঁটি মানুষ। বাতাস দেখে বলতে পারেন, ঢেউয়ের মাপ কত ফিট উঠবে। মেঘের মুখ দেখেই বলতে পারেন, ঝড় উঠবে কিনা! এই সমস্ত গুণ ঈশ্বরের আশীর্বাদ, সকলের থাকে না।'

সারেঙের পর সুকানী। সুকানী আনিসুদ্দীন নোয়াখালির

লোক, চেহারায় গিরিগোবর্ধন, একমুখ কুচকুচে দাড়ি, বা চোখটা ট্যারা, ডান হাতে একটা পুরনো জখমের দাগ। কিন্তু মানব দত্ত ওকে যতটা বোকা বলেছিল, আমার তা মনে হয় না। বরং দত্তর তুলনায় কথা বলে কম, সেই জন্য অনেক সতর্কও মনে হয়।

'পূর্ববাংলায় বাড়ি ছিল?'

'হু।'

'অনেকদিন থেকেই তো আছেন এই জাহাজে?'

'হু।'

'কোন জিলায় দেশ ছিল?'

'নোয়াখালি। আপনার?'

'বরিশাল।'

'কাছাকাছি।'

'দিনের পর দিন এমন সমুদ্রে চরে বেড়াতে ভালো লাগে?'

আমার এই বস্তাপচা প্রশ্নে তার মুখে উপেক্ষা ও বিরক্তির রেখাগুলি জীবন্ত হয়, গলার স্বরেও উষ্মা, 'দিনের পর দিনটা আবার কোথায় ছাখলেন? মোটে তো তিন দিন জলে। তারপরই আর এক বন্দরে। বরং, বেশ আছি—পানিও দেখি, জমিনও দেখি।'

অতঃপর জাহাজীদের সঙ্গে অধিক বাক্যালাপে উৎসাহ আমার নাই; সঙ্গতিরও অভাব। ডেক যাত্রী হ'য়ে কলমের ডগায় চোখটাকে এনে রাখবো, এমন চেষ্টা বাতুলতা। কেবিনগুলিতে ভাগ্যবান ভাগ্যবতীরা হাসাহাসি করছিলো। কোন এক ভদ্রলোকের বাহান্নতম জন্মতিথি পালিত হচ্ছে জাহাজে। তার যুবতী মেয়ে নরম হাতে নরম কেক কাটছে এবং পরিজনদের মধ্যে বিতডন করছে।

আমি হয়তো কোন দিন খুচরো জন্মদিনগুলি টপকাতে টপকাতে বাহান্নতমতে গিয়ে পৌঁছবো, কিন্তু আমার অমন একটি

যুবতী কন্যা কখনোই থাকতে পারে না। বিভিন্ন রসে অভিসিক্ত মানুষগুলি স্নিগ্ধ অন্ধকারে ও আলোতে বেঁচে থাকবার আশ্বাসে নিমগ্ন। কিন্তু ওরা কি বাঁচবে? যুদ্ধ ও মুনাফার লোভ রয়েছে কি জন্য? হয়তো ভুল বললাম। মুনাফাখোররা বেঁচে থাকবে। না, এটাও অদার্শনিক সিদ্ধান্ত। যখন এই দুনিয়াতে শুধুমাত্র মুনাফাখোররা জীবিত, তখন তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নয়, তাদের ইণ্ডাস্ট্রি থেকে শুধু বিষাক্ত গ্যাস ও মারনাস্ত্র উৎপন্ন হয়, তখন প্রকৃত মুষল পর্ব। ইত্যাকার ভাবনাগুলিতে বহুযুগের লালিত বুর্জোয়া সংস্কার তাদের বিনীত প্রস্তাব রাখছে মাত্র, আমি প্রচণ্ড কিছু একটা গঠনমূলক স্বকীয় প্রচেষ্টায় ভেবে উঠতে পারি না, যদিও আমি ইতিহাসের ছাত্র এবং প্রবাদ, ইতিহাস নাকি ভবিষ্যতকে নির্দেশ করে।

সমুদ্রযাত্রার দ্বিতীয় দিনেই আমি হীনমন্যতায় ক্রমশ অসুস্থ, কারণ আমি ডেক-যাত্রী। জাহাজীদের সঙ্গে বাক্যালাপে ধারণা জন্মায়, ডেক-যাত্রীদের তারা করুণার চোখে দেখে। সুবিধা-অসুবিধার কথা উহ্য; আসল কথা, যারা যেখানে যত সংখ্যা-গরিষ্ঠ, তারা সেখানে তত অপাংক্তেয়। জাহাজ চলে, জাহাজ কাঁপে, যাত্রীরা ভীষণ ধূমপান করে, আমি পায়চারি করি। সেই যে ভদ্রলোকের তালা ভাঙ্গতে সাহায্য করেছিলাম, তিনি আর আমাকে তাঁর কেবিনে ডেকে নেননি। কদাচ তিনি এক কোনে, আমি অন্যকোনে,—পরিচিতিতে পূর্ণচ্ছেদ। ভোর রাতে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনি,—মন্ত্রপাঠ করছেন, অশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ। এঁরা ধার্মিক।

খোলের কাছে হাঁটা চলা করি, শেয়ালদা বাজারের গন্ধ পাই। খোলে আলু ও পিঁয়াজের পাহাড়। ঐ দুটি বস্তু আন্দামানগামী প্রতিটি জাহাজে থাকবেই। আন্দামানের উর্বর জমিতে ধান-গম-শাক-সব্জীর ফলন লোভনীয়, কিন্তু আলু ও পিঁয়াজের চাষ নাই।…

গার্ডেনরিচের চার নম্বর জেটি থেকে স্থল-মুক্ত হবার পর তিন দিন তিন রাত্রি, তারপর কচি কলাপাতা রোদ্দুরে সমুদ্রের বুকে ভাসমান একটি দ্বীপকে দেখা গেল। এক জাহাজী জানালো, ওর নাম কোকোদ্বীপ।

'কোকোদ্বীপ নাম হলো কেন? ওখানে বুঝি খুব কোকোর চাষ হয়?'

'কোকোও নয়, কোকেনও নয়। থাকার মধ্যে ওখানে অনেক নারকেল গাছ।'

'এইবার বুঝেছি। কোকোনাট থেকে কোকোদ্বীপ।'

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসি। সামান্য খালাসীও সেই হাসির সামিল হয় না।…কোকো ছাড়িয়ে অনেকটা সমুদ্র পথ অতিক্রম করবার পর নজরে আসে বেশ বড় সড় একটি দ্বীপ্।

এক সময় তো মনে হয়, দ্বীপের খুব কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। ওখানে পাহাড় আছে, সমুদ্র ঘেঁষে অসংখ্য নারকেল গাছ এবং ঘন সবুজ বন।

তখন আমি ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজায়। ক্যাপ্টেনের মাথার ওপর নীল দেয়ালে লটকানো বিদেশী বায়নাকুলার, যা কদাচিৎ চোখে লাগানো হয়, ক্যাপ্টেনের টেবিলের ওপর অপ্রতুল ব্যারবিটুরেটস্; ঐ সবগুলি ব্যবহারের বাসনা আমার বুকে, কিন্তু অধিকার নাই, সাহসও নাই। ক্যাপ্টেনের মুখে এখন পাইপ ঠিকই, সেই তিন দিনের পরিচিত বিশাল পাইপটা, কিন্তু বাদামী ধোঁয়ার সুতোগুলি যে রকম পাতলা ও সূক্ষ্ম, তামাক সম্পর্কে সন্দেহ জাগে, যেহেতু এই জাহাজে এক জোড়া হিপি হিপিনীকে আমি দেখেছি এবং গত সন্ধ্যায় হিপিনী তার পুরুষ্ট বুক দোলাতে দোলাতে ক্যাপ্টেনের কোন আড়ষ্ট জিজ্ঞাসার উত্তরে খিল খিল হাসছিল, বলছিল: ডজ এনিথিং রিঅ্যালি ম্যাটার?

এ একটা ভীষণ আধুনিক প্রশ্ন বা জবাবও বটে। মানুষ যখন

দাকুন উন্নতি করছে, তখন কোন কিছুতেই কি কিছু এসে যায়? সুতরাং, ক্যাপ্টেনের গহ্বরে যদি গাঁজা ঠাসা থাকে, কি আর আসে যায়? বরং ক্যাপ্টেন আয়েঙ্গারের মনে এখন ঈশ্বর অনুভূতি এসে ভর করছে।

আমার দৃষ্টি একবার ক্যাপ্টেনের দিকে, আর একবার ঐ বিশাল দ্বীপের দিকে। এক ঝাঁক পাখিকেও দেখছি উড়তে উড়তে দ্বীপের সবুজ বাজত্বে মিলিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে আমি আমার কাব্যিক আকুতিকে না ছুঁড়ে পারিনা, 'ঐ যেখানে পাখিগুলি নেমে গেল, ও জায়গাটার নাম কি?'

আয়েঙ্গার প্রথমে জবাবই দিলেন না; এমন ভাব দেখালেন, যেন শুনতে পান নি।

আবার জানতে চাই, 'স্যার, ঐ দ্বীপের নাম কি?'

এবার জবাব আসে, 'ল্যাণ্ডফল।'

বলি, 'আমাদের জাহাজটা ওর খুব কাছাকাছি এসে গেছে।'

ক্যাপ্টেনের তির্যক হাসি, 'মোটেই না। দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় আড়াই মাইল।'

'অথচ, এত কাছে মনে হচ্ছে কেন?'

বিচিত্র জবাব এলো, 'দেখার ভুল।

হয়তো তাই। সবটাই আমি ভুল দেখছি। মাত্রাতিরিক্ত কল্পনা-বিলাস। ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হয়। সরে আসি।...

তিন দিন তিন রাত্রি সমুদ্র যাত্রার পরও পোর্টব্লেয়ারে নেমে পড়বার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারছি না। এত বড় জাহাজে এমন কাউকে পেলাম না, যার সঙ্গে সত্য-মিথ্যা গাল-গল্পে নিজের কোন বিচিত্র ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারি। আর সত্য কথা বলতে কি, আন্দামান সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ছবি আমার মনে

আঁকা নাই। জানি, পোর্টব্লেয়ার প্রায় আধুনিক এবং এর আশেপাশে এমন এক-আধটা দ্বীপ আছে, যেখানে জন-বসতির চিহ্ন নাই। এই দুটো অস্পষ্ট ছবিই আমার কাছে সিল্যুট।

জাহাজ বাসের অনেকক্ষণ সময়ই আমি ব্যয় করেছি নিজেরই লেখা উপন্যাস 'নগ্নতাপস' পড়ে। আমি ঠিক ভেবে উঠতে পারছিনা, কি কারণে এক বিখ্যাত সাপ্তাহিক একে এত গালাগাল দিলে। চোখে দেখা অভিজ্ঞতায় যাচাই করা চরিত্র···কি অন্যায় করলাম? রগরগে থিমে তৃতীয় শ্রেণীর গিমিকও প্রাধান্য পাবে, শর্ত—গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য। আমার আনুগত্য নাই, চেতনার স্রোতে যদিও বেঁচে আছি '···কে যেন হো হো করে হেসে উঠলো। বাহান্নতম জন্মদিনের বৃদ্ধ হাল্কা পায়ে হাঁটছেন, পিছনে তাঁর যুবতী মেয়ের লিল্যাক রঙ শাড়ি। আমি চটপট বই-পত্তর, টুকরো'-টাকরা কাগজ পোর্টফোলিওতে পুরে ভাজির সিগ্রেট ধরাই। চারপাশে নর-নারীর চাপা উত্তেজনা, যেহেতু পোর্টব্লেয়ার অদূরে। জেটিতে জাহাজ ঢোকা আর একজিবিসনের দ্বারোদ্ঘাটন যেন একই বস্তু। সেই রকম ঘুম-ভাঙ্গা উত্তেজনা। একমাত্র হিপি ছোকরাকে দেখছি রিল্যাকসড্ মুডে, হিপিনী একটা টাওয়েল জড়িয়ে বাথরুম থেকে বের হচ্ছে, ওর বিশেষ বিশেষ মাসেলের সুইপগুলি স্পষ্ট।

পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হচ্ছে। অজস্র সবুজের রাজত্বে ধূসরবর্ণ বন্দর যেন দু'হাত বাড়িয়ে আছে। আমি চিরদিনই নাস্তিক। তাই কারুর উদ্দেশ্যে প্রণাম না ঠুকে নিজের বুকেই টোকা মারি এবং বলি: ঈশ্বরের বাগানবাড়ি, ঈশ্বরের বাগানবাড়ি।

৩

....

পরিচিত কবি তুষার রায় ভরাট কণ্ঠস্বর ও রুগ্ন শরীর দিয়ে অনবদ্য আবৃত্তি করতে পারেন। আমার গলা আছে, আবেগ কম নয়, কিন্তু সেই এলেম নাই। যেন কোন ভরাট-স্বর সরল অশিক্ষিত চাষা খোলা ময়দানে 'মিয়াকী তোড়ী' গাইবার চেষ্টা করছে। অথচ, আমাদের মধ্যে বোধহয় একটা অলিখিত শর্ত আছে, লেখক বা কবির আবৃত্তি—দক্ষতা অত্যাবশ্যক। অনেকটা সেই শর্ত-পূরণের দাবীতেই আমি অতি পরিচিত এক কবিতাকে উচ্চারণ করি :

'...ফুল ফুটুক, না ফুটুক/আজ বসন্ত...'

না, গোটা কবিতাটা নয়, শুধু একটা লাইন, যা প্রায় প্রবাদে পরিণত। এই উচ্চারণ নিয়ে বাহবা জানানোটা সন্দেহজনক, বিশেষত আমি যদি এখন ক'লকাতায় থাকতুম। কিন্তু যেহেতু আমি অন্য পরিবেশে আন্দামানে, রামশঙ্কর চক্রবর্তীর হাততালি বাহবাকে সন্দেহ করতে পারি না।

'বেশ গলা আপনার।'

বিনয় প্রকাশ না করে খুশিতে শ্রাগ করি।

রামশঙ্কর চক্রবর্তী—দড়ির মতন পাকানো শরীরে বিশেষ দ্যুতি, সাজ-পোশাকে পুরো সাহেব, অথচ গোঁফ-দাড়ি নিখুঁত কামানো নয়, খোঁচা খোঁচা। মাথার পেছনে প্রচুর চুল ঢেউ খেলানো, কিন্তু সামনে কপালের ক্রম-বিস্তার লক্ষণীয়।

এ লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে সময় লাগে না, সুশোভনের বন্ধু সুশোভনেরই বয়সী, মনে হয় বহু মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করতে

এমন অভ্যস্ত যে চকিতেই যে কোন অপরিচিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারে। কিন্তু এ মানুষ আমাকে বৈচিত্র্যের খনিতে পৌঁছে দিতে পারবে কিনা, সন্দেহ। বরং ঈশ্বরের বাগানবাড়ি খুঁজতে এসে আমি আবার পিঞ্জরাবদ্ধ। যদিও কাঠের বাড়ি, বিস্তারে প্রায় প্রাসাদ, সর্বত্রই আধুনিকতার জঙ্গম রূপ, সোফা সেট, আলমারি ঠাসা ইংরেজি নভেল, দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি—খোশ মেজাজে চোখ বুজে যেদিকেই পা বাড়াই, কিছু না কিছুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি হবেই। আমার বকম-সকমে চক্রবর্তীর মুখে এমন একটা হাসি ফোটে যার অর্থ করা যায় না। তবে সে অকপট। কাল রাতে খাবার টেবিলে বসে নিজের ঘটনা বহুল জীবনের ইতিবৃত্ত শুনিয়েছে। আমিও আগ্রহ নিয়ে শুনেছি। তার বাবা ছিলেন দুঃসাহসী ব্যবসায়ী, শেষ বয়সে পোর্টব্লেয়ারে এসে আলু ও পিঁয়াজের ব্যবসায় প্রচুর পয়সা কামিয়েছেন। রামশঙ্করবাবুর ছিল অভিনয়ের শখ, পোর্টব্লেয়ারে একটা এ্যামেচার দলও গড়েছিল, সেই দলেরই এক সদস্যার সঙ্গে প্রেম এবং প্রেমে অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা—মেয়েটি কলকাতায় মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আর ফেরেনি, বর্তমানে নাকি অধ্যাপকের গৃহিনী। চক্রবর্তীর সংসারে কোন মহিলার ভূমিকা নাই, নিজেকে বলিষ্ঠ রাখবার প্রয়াসে প্রায়ই সে তন্ত্র-মন্ত্র চর্চা করে এবং মৈথুনরত সর্প সর্পিনীকে স্বপ্ন দেখে। ঐ স্বপ্ন সে যতবারই দেখে, ততবারই ব্যবসায় তার লাভের পরিমাণ বেড়ে যায়।

মুখের ওপর রুমালটা আলতো বুলিয়ে চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করে, 'কেমন লাগছে আন্দামান?'

'মোটে তো দু'দিন হল এলাম।'

আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্পটা টেবিলের ওপর। একদিক দিয়ে চক্রবর্তীর রুচি সাবেকী, কারণ এই নির্জন-সন্ধ্যাতে টেবিলের ওপর সাজানো নিছক চা ও ভাজা সার্ডিন মাছ। এ সময় মন চায় আরো

উত্তেজক পানীয়। হয়তো চক্রবর্তীর অনাসক্তিও নেই, নিছক বাড়ি বলেই…! যাক, যদিও বললাম 'মোটে তো দু'দিন…', সামগ্রিক আন্দামান না হোক, পোর্টব্লেয়ারের বহিরঙ্গ রূপ কিছুটা যাচাই করতে পেরেছি বৈকি! সেইসব পরিচিত বঙ্গসন্তানদেরই উপনিবেশ। চাকুরি করে, ব্যবসা করে, কেউ বা কয়েক পুরুষ ধরে জমি-জমা গুছিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে, মানুষগুলিকে তো বেশ সুখীই মনে হয়। অধিকাংশরই আদি নিবাস পূর্ববঙ্গ, কথায় বাঙাল-বাঙাল টান। কপালগুণে সুশোভনের চিঠি আমার রক্ষাকবচ, না হলে হয়তো কোন নারকেল-বনে রাত কাটাতে হতো—পোর্টব্লেয়ারে কোন আবাসিক হোটেল নাই! বিলাস বহুল গেস্ট হাউস আছে, আমার মতন অপাংক্তেয়র সেখানে জায়গা নাই। রাস্তা সমতল নয়, পাহাড়া-হৃদয়, উঁচু-নীচু, সাড়ে তিন দিনের সমুদ্র-যাত্রার চেয়ে এই পথের দুলুনি যেন কিছু বেশী; কিন্তু বেশ ঝকঝকে তকতকে, ক'লকাতাবাসীর চোখে গোটা পথটা আয়নার মতন; আর রাস্তার দু'ধারে প্রকৃতি অকৃপণ—হরেক জাতের বিশাল অ-বিশাল গাছ-গাছালি, সারাটা দিন পাখির ডাক শোনা যায়।

যদিও শীতকাল, হাড় কাঁপে না, সমুদ্র-প্রভাবে নাতিশীতোষ্ণ। বাড়িগুলি প্রায়ই ইট-সিমেন্টের নয়, মসৃণ-কাঠের, সূক্ষ্ম কারুকার্যে অনুপম। অ্যাসবেস্টসের ছাদের ওপর ফুলের কেয়ারি, প্রতিটি বাড়ির সামনেই অনেকখানি করে জায়গা। পরিধি গোলাকার নয়, কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ, পূব-পশ্চিম—যে কোন প্রান্তে এসে দাঁড়ালে সমুদ্রের মুখোমুখি। মাটির যেখানে শেষ, সমুদ্রের সেখানে শুরু, সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের ভয়াবহ অসহায়তা অনুভব করা যায়… দূরে-অদূরে ঘন অরণ্যময় দ্বীপগুলি ভাসে।…পোর্টব্লেয়ারে রেঁস্তরা আছে, পানীয় মেলে, ওয়েস্টার্ন মিউজিক অশ্রুত নয়; হোটেল ফেঁদেছে যারা, তারা প্রায় সকলেই মদ্র দেশীয়—ঝালে ও টকে মাখামাখি। পাঞ্জাবী হোটেলও আছে, ঊর্ধ্বপদী টার্কি পাখির

রোস্ট, তরকা ও পরোটা যেখানে অঢেল, তদুপরি আছে যেখানে এসপেরেগাসের টিন ও পর্যাপ্ত হুইস্কি।

পোর্টব্লেয়ারে নাকি চোর নাই। চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি ইত্যাদি সব খুচরো কাজ, যা আজকাল অন্যত্র জীবিকার উপায় হিসাবে প্রায় স্বীকৃতি পেতে বসেছে, পোর্টব্লেয়ারে অতি বিরল। স্থানীয় পুলিশ-বিভাগ অনায়াসে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোতে পারে। অবাক! এই পোর্টব্লেয়ারেই আধুনিক জীবন শুরু হয়েছিল তেরশো পুরুষ আর, সাতশো নারী অপরাধীকে নিয়ে। সেই ১৮৬৩ সালের কথা!···

'প্রজাতন্ত্র দিবসে পোর্টব্লেয়ারে এবার বিশেষ উৎসব হবে।'

—রুমালে ঠোঁটের কোনা মুঁছতে মুঁছতে রামশঙ্কর বলে।

বলি, 'জানি, অনেক বৃদ্ধ বিপ্লবী আসছেন সেলুলার জেলখানায়।'

'হুঁ, তাই। যাবেন আজ সেলুলারে?'

'এই সন্ধ্যাবেলায়?'

'সেলুলারের কিবা সকাল, কিবা সন্ধ্যা! অতবড় একটা ঐতিহাসিক স্পট চোখের সামনে নষ্ট হয়ে গেল! কয়েক বছর বাদে ওখানে আর একখানা ইটও হয়তো খুঁজে পাবেন না। তখন যা দেখবেন, সবটাই নকল, আসল সেলুলার জেল নয়!'

—তার কণ্ঠস্বরে আবেগের ওঠা-নামা। ফস্ করে একটা সিগ্রেট ধরায়, আর একটা এগিয়ে দেয় আমার দিকে। আমি খুশি খুশি প্রত্যয়ে ওর দিকে চেয়ে। জানি, এই জাতের মানুষ কতখানি নির্ভরশীল হয়। নির্ভরশীল রামশঙ্কর চক্রবর্তী নিশ্চয়ই! সজ্জন লোকটির একখানা ছোট্ট অস্টিনও রয়েছে, নিজেই প্রয়োজনে ড্রাইভ করে। গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, সঙ্গতি আছে, অথচ নারী নাই—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, সঙ্গী হিসাবে এরা রমনীয়।···

গ্যারেজটা যেন অনেকটা গহ্বরে, সেই গহ্বরের দরজা খুলে দেয়

এ বাড়ির ছ-ফুটি কেয়ার টেকার; চক্রবর্তীর কোন কুকুর নাই, কিন্তু ওর কেয়ার টেকারকে দেখলে কেউ আর কোনদিন এ বাড়িতে ঝামেলা করতে সাহসী হবে না।

অস্টিনের রঙ মেরুন, যথেষ্ট যত্ন-আত্তির নিশানা। অনেককাল বাদে নি-খরচায় মটোরে চাপছি, বুকের ভেতরটা কৃতজ্ঞতায় গলে গলে পড়ছে। ভোঁ করে সদর-রাস্তায়, খুব লম্ফ-ঝম্ফ। পোর্ট-ব্লেয়ারে কি ধরণের সোসাইটি, জানা নাই, তবে পথে ইতস্তত তরুণ তরুণী নজর কাড়ে। অভাবী মানুষদের ভিড় বলতে যা বোঝায়, এই মুহূর্তে দেখি না; তবে মিশকালো আদিবাসী বংশধরদের চেনা কঠিন নয়। দোকানে দোকানে চড়া আলো, সাইনবোর্ডগুলি বাংলা, ইংরেজি অথবা তামিল ভাষায় লেখা। হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে পায়ের মাসেল টিপছি, এটা আমার ভাবনাহীন বিরাম।

'...এই ডান দিকেই বড় বড় চাষীদের সব্জিবাজার, পোর্ট-ব্লেয়ারের গ্রীণ-মার্কেট, এখানেই আমার একটা বড় পিঁয়াজের আড়ত আছে, এক রিটায়ার্ড পোস্টমাষ্টার আড়তের খাতা লেখেন। ...খুচরো ব্যবসায়ীরা আসে, আমি পাইকারি দরে মাল দি।...'

হেডলাইটের আলো রাস্তার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে। গাড়ির বডিতে চাকচিক্য থাকলেও এঞ্জিনের যে বয়স হয়েছে, তা তার গোঙানি শুনলেই বোঝা যায়।

সুভাষ ম্যানসনের বাঁদিকে গাড়ি বাঁক নেয়, চক্রবর্তীর প্রশ্ন, 'দেখুন, পথ কেমন ফাকা। আর আপনাদের কলকাতায় এখন?'

কলকাতার পথের সঙ্গে পৃথিবীর কোন শহরের রাস্তা-ঘাটের আর তুলনা চলতে পারে? মাছি-মশা-মানুষের সঙ্গে জঞ্জালের পাহাড় এবং তৎসহ পৌরপতি ও মন্ত্রীদের আস্ফালন—প্রাণ আছে, প্রাণ আছে।

চক্রবর্তীকে বলি, 'কলকাতায় এখন মানুষের স্রোত, সুন্দর জনারণ্য!'

'পোকার মতন থিক থিক করছে?'

'তা বলছেন কেন? লক্ষ লক্ষ জনতার ভিড়ে নর-দেবতার অভিষেক।'

নিঃশব্দে হাসে সে। আবার গাড়ি বাঁক নেয়। নিষ্কম্পস্বরে বলে, 'কলকাতার সঙ্গে আমারও পরিচয় আছে।'

'মাঝে মাঝেই যান বুঝি?'

'প্রায় তাই। বছরে বার তিনেক।...আর সন্ধ্যা থেকে রাত আটটা অব্দি গড়ের মাঠের কাছাকাছিই থাকি।'

লাস্ট ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের মতন শরীর এলিয়ে কান পেতে শুনছি। তখনই কোথায় যেন রেডিওতে সন্ধ্যা খবর বাজে, 'ইয়ে আকাশ বানী হ্যায়, অব আপলোগ সমাচার...'। আর শোনা যায় না। জায়গাটা পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছি।

চক্রবর্তী: ঐ সময় গড়ের মাঠের কাছাকাছি কেন ঘুর ঘুর করি, জানেন?

আমি: সঠিক বলা সম্ভব নয়।

চক্রবর্তী: তা হলে আর কি ক'লকাতায় থাকেন!

আমি: গড়ের মাঠের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান লড়াই সুবাদে।

আর কখনো-সখনো যাই ফুচকা খেতে। (ঐ প্রকার ফুচকা-খাবার অভিজ্ঞতা আমার এ যাবৎ তিনবার। কিন্তু প্রসঙ্গটা আমি সুযোগ পেলেই উত্থাপন করি, যেহেতু ঐ বিশাল-ময়দানে ফুচকা খাওয়া আনতেলেকচুয়াল আধুনিকতা।)

চক্রবর্তী (হেসে): বেশ, বেশ, আমি কিন্তু যাই রাত কাটাবার মতন কাউকে যোগাড় করতে। যেন একটা বোমা ফাটলো। আমি একটু সোজা হয়েই আবার এলিয়ে পড়ি। রামশঙ্কর চক্রবর্তীর সাইকিয়াট্রিক্ রেকর্ড যেন মুহূর্তে স্পষ্ট। পাশ ফিরে তাকাতেই দেখি, মুখের ভগ্নাংশ, এলোমেলো রেখার অভাব নাই, চিবুকের ওপর একটা নীল-শিরার দপ্দপানি।

আট বছর আগে পোর্টব্লেয়ারে অ্যামেচার থিয়েটার পার্টির সদস্যা সুচন্দা করগুপ্তা, পুলিশ অফিসারের মেয়ে, নাটকের মহড়া শেষ ক'রে ফিরতে ফিরতে যখন রাত ঘন হয়, বড় বড় চোখ মেলে রামশঙ্করের দিকে তাকায়। দলে তো রামশঙ্করই একমাত্র, যার গাড়ি আছে···সুচন্দা রামশঙ্করের গাড়ীতে উঠে বসতো, এ রকমই আবছা-আবছা আলো-অন্ধকারে দু'জনে যুগলবন্দী।···সুচন্দা তো ডানাকাটা পরী ছিল না, দুই বাহুতে লোমের আধিক্য; কিন্তু যা আকর্ষণীয়, তা ওর স্বাস্থ্য, বাচনভঙ্গি, সল্টেড কাজুবাদাম চিবানো। 'আমি ওকে যতবার চুমু খেয়েছি, ও আমার বুকে ততবারই চিমটি কেটেছে। একদিন সুপার মার্কেট থেকে ভালো আপেল কিনে দিয়েছিলাম। আপেল নিয়েই বিবিধ রসালাপের মাধ্যমে আমি সুচন্দার সেকসের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করি, অর্থাৎ কিনা আমি ওর ভরাট বুক দুই মুঠোতে পাকিয়ে ধরেছি। অনেকবার—অনেকবার। কিন্তু ঐ অব্দিই, এর বেশী চাইতে গেলেই তার চোখ গরম। সে জিনিস পেয়েছে এক ম্যাদা প্রফেসার। খবর সবই রাখি। এক গণ্ডা কাচ্চা-বাচ্চা, চেহারায় আর সেই জলুস নাই, রং যতই মাখুক। সুচন্দা সুন্দরী এখন সুচন্দা মাগী হয়েছে।···'

—ইস, সুশোভনের বন্ধু খিস্তি দিয়েছিল।

আমি চমকালেও গাড়ি যথাপূর্বম গতিতে। ডিমের কুসুম যেন ঐ নিওমর্ডানিস্ট দোকানটা, কলকাতার গোল্ডেন ড্রাগনকে মনে করিয়ে দেয়।

'কি মশাই, ভড়কে গেলেন?'

'ভড়কাইনি, সামান্য চমকেছি।'

'পুরুষ মানুষ, পকেটে পয়সা আছে, শরীরে তাগদ আছে··· মেয়েমানুষের দরকার নাই?'

'আছে। সেই জন্যই তো বিয়ের বন্দোবস্ত।'

'বিয়ে', অহেতুক খানিকটা হা হা করে হাসে চক্রবর্তী, 'বৈধ

মেয়েমানুষ। তা আগে হলে হতো। এখন নানা রকম মাল চাখতে চাখতে রুচিটা সার্বজনীন হয়ে গেছে।'

'অত রকমারি পোর্টব্লেয়ারে লভ্য ?'

'ইচ্ছে হলেই পেতে পারি। কিন্তু এখানে খুঁজি না। স্বস্থানে সুনামের বড় প্রয়োজন। বিদেশে আপনি লম্পট হন, মাতাল হন্ কে আর দেখতে আসছে। এই যে আপনি, দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসে যদি আদিবাসীনীদের নিয়ে একটু আধটু ফুর্তি আমোদ করেন, কে আর আপনার চরিত্র হননে ব্যস্ত হ'য়ে পড়বে ? অবশ্য আপনি যদি পাক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মতন বিখ্যাত লোক না হন।'

এবার খুক খুক হাসি, চিবুকের নীল শিরাটা সুখে অথবা যন্ত্রণায় তির তির কাঁপছে।

'কি গুপ্ত মশাই, কেমন একটু ক্ষিদে ক্ষিদে পাচ্ছে না ?

'তা পাচ্ছে বটে।'

'তা হলে চলুন কোন ভালো রেঁস্তরায়—রাতের খাবারটা সেরে নি।'

'উঁহু, এখন নয়: আগে সেলুলার জেল দর্শন করি।'

'কি আর দর্শন করবেন! সেলুলারের কিবা দিন, কিবা রাত, সব সমান—খালি অন্ধকার।'

'এ রকম দশা হলো কেন ?'

'কংগ্রেসের অহিংস ভ্যাগুালেরদের কীর্তি।'

গাড়ী থামে কয়েদখানার সামনে। হঠাৎ যেন দলাপাকানো কি একটা বস্তু আমার চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যায়। চক্রবর্তী বলে, 'বাদুড়।'

বাদুড়, চামচিকা ইত্যাদিরা আস্তানা গেড়েছে এখানে। সেলুলারের কিবা সকাল, কিবা রাত…'—চক্রবর্তীর কথা আক্ষরিক সত্য। লাঞ্চ ও ডিনার অন্বেষী মানুষ, যারা অন্তত কল্পনাতেও লাল কার্পেট বেয়ে উপর নীচ করে, ঐ কদর্য দেয়ালগুলি দেখলে

বিরক্ত হবে। লং শট, ক্লোজ আপ—যেখান থেকেই ক্যামেরা পাতা হোক না কেন, সেলুলার জেলের কোন ইমেজ ধরা দেবে না। এর যতখানি ইমেজ, সবটাই ইতিহাসের পাতায়, চাক্ষুষ স্মৃতি কিছুই নাই। এখন বাস্তবে মহেঞ্জদাড়োরও অধম। সরকার বাহাদুরের জাতীয় স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থাকে হাততালি দিয়ে বাহবা জানাতে হয়।

কয়েদখানার অর্ধেকটাই ভূমিশয্যা নিয়েছে, রীতিমত ফাঁকা, যেন হা ক'রে গিলতে আসছে, আন্দামানের আদিতম দ্বীপগুলিরই মতন। যে সমস্ত অংশ এখনো দাঁড়িয়ে আছে, খাপছাড়া, যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পাড়ে। কালিগোলা অন্ধকার, ক্ষুদে ক্ষুদে জোনাকিরা দাঁত ছড়িয়ে হাসছে। আহাম্মকের মতন ইতি উতি তাকাই, কাউকে হয়তো দেখতে পাবো। কেউ নাই। সেলুলার বুঝি তার স্বীকৃতি পেল না।

যেমন যথাযথ সমাদর পায়নি বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'—ত্রিশ বৎসরে মোটে চারটি সংস্করণ। হায়রে, আমরা দস্তয়েফ্স্কির 'মৃত্যুপুরীর ডায়েরী' পড়ে মূর্চ্ছা যাই, অথচ হাতের কাছে মস্ত খনি 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র খবর রাখি না। বিচিত্র নির্লিপ্ততায় আন্দামান-নির্বাসিতের মানসিক যন্ত্রণা তিনি বর্ণনা করেছেন। বাহুল্য নাই, অথচ শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের অলৌকিক ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রতি ছত্রে ছত্রে :—

"ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু
যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে"

[হে দশম গুরু পিতা, তুমি ধন্য! তুমি চড়াই-পাখিকে নিয়ে বাজ শিকার করিয়েছিলে ; তুমি ধন্য।]

সেলুলার জেলে নির্বাসিত বন্দীরা অনেক সময় একত্রিত হ'য়ে দেশ-বন্দনা করতেন। উপেন্দ্রনাথ বর্ণনা দিয়েছেন :—

"গানটা শুনিতে শুনিতে মানস চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে,

হিমাচল ব্যাপী ভাবোমত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত— দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখনো স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

দীনতা, ভয়, মৃত্যু—সেলুলারে আবদ্ধ বিপ্লবীরা এই তিনের ঊর্ধে।...

৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯, জাপ কর্তৃপক্ষ আন্দামানকে তুলে দেন আজাদ-হিন্দ সরকারের হাতে।

আন্দামানই তো ভারতের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চল। কল্পনা করতে পারি, সেলুলারকে স্মরণে রেখে নেতাজী ঘোষণা করছেন: আজ থেকে আন্দামানের নতুন নাম হলো শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ।...

ইংরাজ ও দেশী মুরুব্বিদের কাছে আন্দামানের গুরুত্ব অনেক। এমন বনজ ও পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় যদি ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতাকে গুম ক'রে ফেলা হয়, বহুকাল কাক পক্ষীতেও টের পাবে না। খুনে, ডাকাত, বদরাগী, দুশ্চরিত্র লোকগুলির পাশাপাশি এনে রাখা হবে শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের,—স্বাধীনতাপ্রয়াসীর এমন কণ্ঠশ্বাস ব্যবস্থা বুঝি আর হয় না।

উত্তর প্রদেশের গভর্নর স্যার জন হিউয়েটের মাথাতেই প্রথম এই বুদ্ধিটা আসে। ভাইসরয় লর্ড মিটোর কাছে প্রস্তাব রাখেন, আন্দামানের কয়েদখানায় সবচেয়ে মারাত্মক বিপ্লবীদের পাঠানো হোক। জনবহুল অঞ্চলের জেলখানাগুলিতে ঐ সব বিপ্লবীদের ঠাই দেওয়া আদৌ নিরাপদ নয়। তাঁদের নির্বাসন দেওয়া উচিত এমন জায়গায়, সাধারণের শুভেচ্ছা বাণীও যেখানে পৌঁছতে পারে না। সেই জায়গা আন্দামান, সেই কয়েদখানা সেলুলার। শত শত মাইল দূরে ঐ রকম এক আদিম জায়গায় বন্দীদের ওপর কি রকম বন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষ জানতেই

পারবে না। রুশ জারের যেমন সাইবেরিয়া, ভারতের তেমনি হোক আন্দামান।

ব্যবস্থা পাকাপাকি হতে বিশেষ সময় লাগে নি। দফায় দফায় আন্দামানে চালান যেতে থাকে ভারতবর্ষের সহিংস মুক্তি সংগ্রামীরা। প্রথম দলে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা, —উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, বিভূতি-ভূষণ সরকার, ইন্দুভূষণ রায়, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

উত্তর প্রদেশ থেকে পাঠানো হলো এমন দু'জন রাজবন্দীকে, যাঁরা স্যার জন হিউয়েটের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন,—সেই রামহরি ও মতিলাল।

...এরপর বিনায়ক দামোদর সাভারকর, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাশ, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখ।...

সেলুলার জেল চরিত্রে হলো ভয়াবহ। অত্যাচারের বিবিধ উপায়-প্রকরণ নিয়ে সেখানে যেন চলে পরীক্ষা-নিরিক্ষা। সেই অমানুষিক অত্যাচারে আত্মহত্যা করলেন ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্তর দেখা দেয় মানসিক বিপর্যয়, ননীগোপাল শুরু করলেন ৭২ দিন ব্যাপি ঐতিহাসিক অনশন। মহাবিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের সহযোদ্ধা মহাবীর সিং, মোহন কিশোর, মোহিত মৈত্র অসহনীয় অত্যাচারে আত্মাহুতি দিলেন একে একে। তমাম ভারতবর্ষে বিক্ষোভের যত ঝড় উঠেছে, সেলুলার জেলের ক্ষুধা তত বেড়েছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, আশানুল্যা হত্যা, ওয়াটসনকে হত্যার চেষ্টা, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে বিপ্লবী ও পুলিশদের মধ্যে যুদ্ধ, চরমগুরিয়ার পোষ্টঅফিসে ডাকাতি, আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে ডাকাতি, ইটাখোলায় ট্রেন-ডাকাতি, দাসপুরে দারোগা হত্যা...সেলুলার জেলে শত শত বিপ্লবীর আবির্ভাব। ক্রমে ক্রমে সেলুলার যেন একটি তীর্থভূমি। সেই তীর্থভূমি আজ নেহাতই এক ধ্বংসস্তূপ। কেন?...

সেলুলারের কাঠামো তৈরীর ইতিহাস বিচিত্র। আন্দামানের ইট-কাঠ-লোহা-লক্কড় দিয়ে তৈরী নয়।

"...জাহাজ ঠাসা ইঠ এলো রেঙ্গুন থেকে, লোহা-লক্কর এলো বিলেত থেকে, চুন-সুরকির আমদানি কলকাতা থেকে। জেলের প্ল্যান করা হলো অনেক ভেবে-চিন্তে।

মাঝখানে থাকবে চারতলা একটা গম্বুজ। গম্বুজকে ঘিরে সাত দিকে সাতটি উইং বা শাখা প্রসারিত হবে। প্রত্যেকটি উইং হবে ত্রিতল বাড়ি। গম্বুজের মাথায় রাইফেল ঘাড়ে নিয়ে সিপাই পাহারা দেবে, দিন-রাতে সেলের লোহার রেলিং ঘেরা বারান্দায় লণ্ঠন হাতে ওয়ার্ডেন পাহারা দেবে।

দোতালা বা তিনতলায় তিনজন একসঙ্গে পায়চারি করতে পারবে না। মাঝরাতে ওয়ার্ডেন বদল হবে; সমস্ত জেল, সকল কয়েদী থাকবে চোখের নাগালের মধ্যে।..."*

একটা ঐতিহাসিক কয়েদখানার বিবর্ণ বিবর্তন দেখে বেশ কিছুক্ষণ আমরা পোড়খাওয়া মানুষের মতন ঝিম মেরে গেছি। অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যুতেও বুঝি এতখানি বিচলিত নই। কিন্তু মজার ব্যাপার, পুরনো গাড়ী তেজীয়ান গলায় হুঙ্কার ছাড়তেই মন থেকে ইস্তক আশা-নৈরাশ্য মুহূর্তে কর্পূর। যথেষ্ট খিদে পেয়েছে। সমুদ্রের হাওয়া রুচিকর। পেটে সব সময়ই রাবনেরচিতা। দেখে-শুনে "রঙ্গস্বামী হোটেল"-এ গাড়ী পার্ক করায় রামশঙ্কর চক্রবর্তী।

হুঁ, বহিরঙ্গে "রঙ্গস্বামী হোটেল" রীতিমত আধুনিক। আলোর কায়দায় পাকা আপেলের মতন রঙ দেয়ালের। নাতিদীর্ঘ হলঘর, চৌকো চৌকো টেবিলকে ঘিরে ক্ষুদে ক্ষুদে চেয়ার। প্রথম দর্শনে মানুষগুলিকে রোগাক্রান্ত মুরগি বলে মনে হবে। পুরুষদের গাঢ়

রং পোশাক, মেয়েদের হালকা। এখানেও চুল ও খোপার বাহার লক্ষণীয়। বাচ্চা কাচ্চা বড় একটা চোখে পড়ে না।

পোর্টব্লেয়ারে সম্প্রতি নাকি একটি কিণ্ডার গার্ডেন হয়েছে; আমাদের থেকে হাত পাঁচেক দূরে আপন মনে "ধোয়ার রিং যিনি রচনা করছেন, চেহারায় ও পোশাকে রীতিমত আনতেলেকচুয়াল, কফি হাউসেও বেমানান হবেন না।

লাঞ্চ শুরু হলে মুখ খোলে চক্রবর্তী—'জেল দেখে যে হতাশ হয়েছেন, খুব বুঝতে পারছি।'

আমি নিঃশব্দ।

সে একটা হাড় চুষতে চুষতে বলে, 'দেখাবো আপনাকে সবই। আশেপাশের দ্বীপগুলিও ট্যুর করে আসবেন। কিন্তু তার আগে এখানকার দু-একজন মানুষের সঙ্গেও আপনার আলাপ-পরিচয় হওয়া দরকার।'

জলের গ্লাসটা নামিয়ে বলি, 'পাঁচটা সাদা-মাটা মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার কোন ইচ্ছা আমার নাই।'

চক্রবর্তী ভুরু নাচায়, 'আপনার সঙ্গে প্রথমেই যার আলাপ করিয়ে দেবো, সে মোটেই সাদা-মাটা নয়। রীতিমত বৈচিত্র্যে ঠাসা।'

'বটে। মানুষটা কে?'

'মহল' স্টিমারের মালিক তথা ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ।'

'থাকেন কোথায়, পোর্টব্লেয়ারে?'

'কখনো পোর্টব্লেয়ারে, কখনো ইষ্টআইল্যাণ্ড। আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে তাকে। খুব খেতে পারে, খাওয়াতেও পারে।'

'মাল খায় তো?'

'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ।'

—চক্রবর্তী হা হা করে খানিকটা হাসে। উৎকট শব্দে আনতেলেকচুয়াল যেন বিরক্ত হলেন। অন্য সবাই কিন্তু নিজের

জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। বাঙ্গাল ভাষায় আঁকা-বাঁকা বাত্‌-চিত্‌ চলেছে। কে যেন আবার গান ধরেছে,—ঢাকার বাঙাল শিয়ালদা স্টেশানে নেমে তাজ্জব :

ল্যামা ইস্টিশানে গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী-মিয়ার রঙমহলে
ঢাহা জেলায় বগ্যাল ছাড়ি।...

আর আমার চোখে-নাকে জল। দারুন ঝাল! ঝালের জ্বালা মেটাতে তেতুলের জল। দক্ষিণ-ভারতীয় খানা খেয়ে তবিয়ত্‌ 'আচ্ছা' থাকলে হয়। বুঝতে পারছি, রামশঙ্কর আজকের সন্ধ্যা ও রাতটাকেও নিরামিষ করে রাখবে! অথচ, এখন, হ্যাঁ এখনই, একটা খোকা বোতল পেলে...।

৪

....

এই সবে ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছি। আবার তাঁর সঙ্গে আজই মুলাকাৎ হবে, যখন নির্জিব রাত নির্জনতায় খাঁ খাঁ করবে, পোর্টব্লেয়ারের কাঠের বাড়িগুলিতে ঘুণ পোকার গান শুরু হবে। তখন আমরা মহম্মদের ট্যাগ 'মহল'-এ চেপে ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের বাতিঘরের দিকে ছুটবো। খানা-পিনা হবে, জালি চালকুমড়োর মতন পেটটা সামনে বিছিয়ে তাঁর সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা শোনাবেন ক্যাপ্টেন। রামশঙ্করকে ধন্যবাদ। এ সব যদি ঠিক ঠিক হয়, আমার আর আক্ষেপ থাকে না।···

'আন্দামান টাইমস্' আন্দামানের 'আনন্দবাজার'। কাগজ পড়া যাঁদের অভ্যাস, 'আন্দামান টাইমস্' তাঁদের চাই, সংবাদ ও সাহিত্য দুই আছে, বিজ্ঞাপন-দাতারাও এর উপকারিতা বোঝেন। বিকেলে ঐ কাগজে নিজের কারবারের বিজ্ঞাপন দিতে গিয়েছিল রামশঙ্কর, যথারীতি সঙ্গে ছিলাম আমি। সেই থেকে সান্ধ্য ভ্রমনের শুরু।

শনিবার, ক'লকাতা হলে রেসের কথা মনে আসতো, এখানেও ফাঁকা ফাঁকা পথ-ঘাট, কাছাকাছি কোথাও ময়দান আছে নাকি? আমাদের ধাবমান গাড়ীটাকে টগবগে চোখে লক্ষ করছে অনেকে।

'আজ আমরা মদ খাবো, ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের ডেরায় গিয়ে মাল টানবো।'

—গলার স্বরটা অপরিষ্কার রেখে মাতালের মতনই বলেছিল চক্রবর্তী। অস্পষ্ট একটু হেসে আমি ঘাড় কাত করি, অর্থাৎ আমার

সম্মতি আছে। শুধু সম্মতি! বুকের ভেতর গত তিন দিন যাবৎ সমানে হৈ-হল্লা চলেছে—একটা খোকা বোতল। সুস্থ তাজা দিনগুলি পেরিয়ে যাচ্ছে। আমি কি ঈষৎ রঙিন হবো না?…

এ-পথ সে-পথ চক্কর লাগাতে লাগাতে গাড়ী একেবারে সমুদ্র কিনারে, যেখানে নাতি দীর্ঘ বালুবেলার শুরুতেই 'বার পিয়ার্স।' আমি কখনো কোন মদ্যপানের ঘাঁটিতে এ রকম ঐতিহ্যের গন্ধ পাই নি! বড়সড় চৌকো ঘর, যার তিন দিকে প্রবেশ পথ হাট ক'রে খোলা। আমরা যে পথে ঢুকছি, সেই পথের ওপর স্যর পিয়ার্সের স্ট্যাচু, বহু বছরের ধকলে বিবর্ণ, কাক ও পায়রার বিষ্ঠায় মাখামাখি। প্রবাদ, পিয়ার্স নাকি তার এক আদিবাসিনীকে সোহাগ জানাতে এখানে এসে বসতেন, একর্ডিয়ন বাজাতেন, আদিবাসিনী নাচতো, খাঁটি লিসবনী বোতলের গন্ধে বাতাস থাকতো ম ম।

পিয়ার্সের নামেই রেঁস্তরা-কাম-বার, দেয়ালেও তাঁর মস্ত প্রতিকৃতি, ভাটার মতন দুই চোখে আর যাই থাক, প্রেম নাই।

'এই হলো পিয়ার্সের ছবি। আদিবাসীদের হাতে খুন হয়েছিলেন।'

—চক্রবর্তী গর গর গলায় বলে। পিয়ার্সের ছবির পাশেই ঈশ্বর পুত্র যীশুর ছবি, ছবির নীচে অমৃত বাণী: Live and let live!…ক্রমশঃ ডান'দিকে হুইস্কি, জিন, বীয়ার ইত্যাদির সচিত্র বিজ্ঞাপনগুলি যেন লাফাচ্ছে।

খুট করে শব্দ, ঢুকবার মুখে আমার হাত কপাটে লাগে; তখনই মাপা হেঁচকি তুলে আমার বগলের নীচ দিয়ে কে একজন বেরিয়ে গেল; আলো উজ্জ্বল নয়, উজ্জ্বল আলোতে মদ্যপায়ীর মেজাজ ঠিক থাকে না; এখানে কারুর মুখাবয়ব স্পষ্ট নয়, একে অপরকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করতে পারে না; স্বর চাপা; কখনো ঠোকাঠুকি লাগা চকমকি পাথরের মতন কোন কোন মদালসার খিল খিল হাসি; মেঝেতে কার্পেট, তবু যেন ভিজা ভিজা; ভাবলেশশূন্য

চোখ আর মুখ নিয়ে বারের ক্যাশিয়ার পয়সা গুনছে ;…এবং সামুদ্রিক বাতাস, তিন দিক দিয়েই ঘুরে ঘুরে আসে, ঝাপটা মারে।

'বার পিয়াসে' এই মুহূর্তে যারা বসে আছে, তাদের কেউই হয়তো নিছক স্থলচর দ্বি-পদী নয়, অনেকেই রোমহর্ষক সমুদ্রাভিমুখে, হয়তো সামনে আদিগন্ত সমুদ্র ও মাথায় গোটা বিশাল আকাশ নিয়ে তাদের কেউ ক্যাপ্টেন, কেউ মেরিন এঞ্জিনীয়ার, কেউ ফার্স্ট মেট। মানুষগুলি প্রায়শই পাতলা চুল, রক্তচক্ষু, সামগ্রিক অভিব্যক্তিতে গভীর তৃষ্ণা—প্রস্তুত হচ্ছে ককটেল, বিশেষ ধরণের ককটেল, যার জন্য বার পিয়াস এত প্রসিদ্ধ।

'এখানেই পাওয়া যায় ক্যাপ্টেন মহম্মদকে।'

—ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চক্রবর্তী বলে। ঠিক আমাদের পাশেই খাকি য়ুনিফর্ম পরা একটা মানুষ টলছে, বিড় বিড় করছে, 'শালার কোথায় যে বাথরুম…'। ওর কোমরে বেল্টশুদ্ধ রিভলবারটা দুলছে, ওকে বাথরুমের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত নয় কেউ।

'গোলাম মহম্মদ! গোলাম মহম্মদ কোন দিকে।'

—আঙুল গুনে অঙ্ক কষার মতন চিন্তিত স্বর চক্রবর্তীর, তার দৃষ্টি চারদিকে ঘুরতে থাকে।

আর ঠিক তখনই এক কোন থেকে শোনা যায় দরাজ গলা, 'হ্যালো, চক্রবর্তী! কাম-কাম!'

'ওঃ! মহম্মদ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম!'

'এই আমি, আমিই!'

এমন সোচ্চার আত্মঘোষণা সচরাচর শোনা যায় না। সংলাপ তো নয়, যেন মধ্য দুপুরে আচমকা সেহালায় ছড় চমক। আমরা পায়ে পায়ে মহম্মদের দিকে এগোয়। রেডিওগ্রামে রেকর্ড চড়লো তখন, চড়া স্বরের উন্মাদনা চকিতে জমাট নির্জনতাকে ঝলসে দেয়, যাবতীয় শালীনতাকে দুমড়ে মুচড়ে কোত্থেকে খাপখোলা একটা মেয়ে খাপছাড়া নাচ শুরু করে।

আমার ভিতর একটু শির শিরে অস্বস্তি, ততক্ষণে অবশ্য চক্রবর্তী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, ধব ধবে মোটা লোমশ আর একখানা হাত ঐ একই আগ্রহে এগিয়ে আসে। সাত-পাঁচ ভাবার সময় পেলাম না, তার আগে আমিও সেই স্পর্শের নাগালে।

তিনি যেন জমিদারী মেজাজ নিয়ে বসে আছেন, কাছে-দূরের নর-নারীরা মাছির মত ভন ভন করে, তাঁর ভ্রুক্ষেপ নাই। তাঁর বসে থাকার মধ্যে কিছুটা শৈথিল্য, কিছুটা বেপরোয়া ভাব। যদিও আলোর জোর কম, সমগ্র অবয়ব—মায় শরীরের প্রতিটি রেখা অব্দি দৃষ্টিবদ্ধ স্থির।

'দাঁড়িয়ে কেন চক্রবর্তী? চেয়ার টেনে বসো। আপনিও বসুন।'

—এ্যালকোহলিক প্রভাবে গলার স্বর গোঙানোর মতন। আমরা বসি। তারপরই ক্যাপ্টেন হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক। ঠিক কোন দিকে চেয়ে আছেন, অনুমান করা কঠিন। এই মুহূর্তে তাঁর ঐ দেখা না দেখার ব্যাপারটা এক রহস্য। মনে হয়, খেলাছলে কিছু আওয়াজ তুলে আবার নিঃসীম স্তব্ধতায় হারিয়ে যাচ্ছেন। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। বয়স? তা পঞ্চাশের ধারে কাছে হবে। চুলের রং ইতিমধ্যেই ধূসর ও সাদাটে সাদাটে, রুবেন্সের আঁকা 'প্রৌঢ়' ছবির মতন। চামড়া যথার্থ ফরসা নয়, রোদে-জলে তামাটে; গ্রীক ভাস্কর্যের সুঠামতা নাই, মেদ বহুল মুখে চোয়ালে গুটি কয়েক রেখা কখনো গভীর, কখনো অগভীর; নাশা উন্নত নয়, প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফস্-ফস্ শব্দ ওঠে; মোটা ভুরুর নিচে বড় বড় দুই ধাতস্থ চোখের রং প্রবাল-প্রবাল। গোল টেবিল, টেবিলের ওপর বার পিয়ার্সের বিখ্যাত ককটেল—পাতলা গেলাস, জলের জাগ।

চক্রবর্তী [স্বরে কৃত্রিম উত্তেজনা]: ক্যাপ্টেন, তোমার সঙ্গে আজ সাতদিন বাদে দেখা।

ক্যাপ্টেন [আবছা অন্ধকারের সমুদ্র থেকে জেগে, ভুরু কুচকে] : উঁহু, সাতদিন নয়, বারো দিন। কোথায় ছিলে ?

চক্রবর্তী : বারো দিন! তা হবে। খুব ব্যস্ত ছিলাম তো, ব্যবসা নিয়ে।

ক্যাপ্টেন : রঙ! সেন্ট পারসেন্ট ভুল পথে চলেছো। কি হবে হে অত পয়সা নিয়ে ? খাবেটা কে ?

এ প্রশ্নের জবাব নাই। ছাইদানিতে ছাই ঝারতে ঝারতে চক্রবর্তী সলজ্জ হাসে।

আমি পুংখানুপুংখ দু'জনকেই দেখছি। এক সময় ক্যাপ্টেন আমার দিকে ঝুঁকে মুচকি হাসেন : আপনাকে তো চিনলুম না ?

চক্রবর্তী পরিচয় করিয়ে দেয় : 'আমার দোস্ত, কলকাতা থেকে বেরাতে এসেছে। স্বভাবে লেখক। জীবনকে জানতে চায়। আর সেই জন্যই তোমার কাছে নিয়ে এলাম।'

কাটা কাটা কতগুলি শব্দ রচনা ক'রে যেন আমাকে ব্যাখ্যা করলো চক্রবর্তী। স্বাভাবিক কারণেই আমি তখন অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে, যেখানে ভিন্ন এক শব্দের উৎস,—হোটেল-গার্ল তার বসন-ভূষণগুলিকে মুক্তি দিচ্ছে একে একে, চরম কিছু প্রাপ্তির আশায় এখানে প্রায় সকলেই দারুণ সেনসেটিভ।...

চক্রবর্তীর আলতো চিমটি খেয়ে আমি আবার ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকাই।

'জীবন', গেলাসে খয়েরী পানীয় ঢালতে ঢালতে ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ বলেন, 'আমার কাছে জীবন আছে নাকি ? আই মিন, আমার প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে বৈচিত্র্য কিছুই নাই।...আমি তো মশাই বারো আনা জলের মানুষ। জলের মানুষ মজা পায় কোথায় ?'

দক্ষিণ-পশ্চিম দরজা দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক বাতাস আসে, বাতাসে সমুদ্রের স্বাদ, ফুলকাটা পর্দাটা সরে যায়, অকৃপণ চাঁদের আলোতে বার পিয়ার্সের ঐ দিকের লনটা স্পষ্ট,—গাছপালা

সাজানো ছোটখাটো একখানা বাগান, যার বুক চিরে সুড়কি ঢালা পথ, পথের দু'ধারে কচি চারাগুলিকে বাড়ন্ত করবার জন্য বাঁশের খাঁচা, আকাশমুখো ইউক্যালিপটাসটা চাঁদ ছুঁই ছুঁই, সব মিলিয়ে ঐ আলোর চাদরে মুড়ি দিয়ে পৃথিবী ঘুমে অচৈতন্য ছিল, এমন সময় সমুদ্রের গোঙানি ও ভেজা বাতাসের দামাল ঝাপটা,—তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়, পৃথিবী জেগে ওঠে।

ক্যাপ্টেন গেলাসে চুমুক দিলেন, হাসির ভঙ্গি করলেন, 'মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য আসে কিসে? পাপে। কিন্তু জাহাজের চৌহদ্দির মধ্যে বাস করে আমরা সহজে পাপ করি না। কারণ, সমুদ্রের বিচার বড় নিষ্ঠুর, ভীষণ প্রতিশোধস্পৃহা, ক্ষমা নাই!'

স্বপ্নিল আতঙ্কে যেন আছড়ে পড়ে তাঁর ফস্ ফস্ নিশ্বাস। বুঝি এখনো তাঁর চারদিকে সীমাহীন সমুদ্র এবং সেই ফেনিল সামুদ্রিক আত্মায় ভয়াবহ উত্তেজনা।

কিছুক্ষণ বিরাম, এক গেলাস খয়েরী ককটেল তাঁর গলা দিয়ে নেমে গেছে, পাঁচ আঙ্গুল মেলে কোন অদৃশ্য বস্তু অনুভবের চেষ্টা করলেন, খুক খুক ক'রে হাসলেন, কপালের ওপর হাত রেখে বললেন,—'তবু পাপ কি করি না? জরুর করি। মানুষ শালা অন্যায় করবে না, পাপ করবে না, দুশমনী করবে না, তা কি হয়? আমরা ভালোও বাসবো, বেইমানিও করবো। সমুদ্র যতই ক্ষেপুক, স্বভাব বদলাবে না।'

ক্যাপ্টেনের মুখের রেখাগুলি কুয়াশার মতন ঝাপসা, তাঁর দুর্বোধ্য উত্তেজনা আবার বাড়ে। অবশ্য পর মুহূর্তেই নিজের রস বোধে ডুবে গেলেন গোলাম মহম্মদ, 'এই তো এখনই কেমন অন্যায় করছি, দেখুন না—আমি, শালা অমৃত চাখছি, আর আপনারা শুকনো ঢোক গিলছেন। এও মাইরি এক জাতের বেইমানি। হে-হে-হে···

হাসতে হাসতে কাঁচের গেলাসটা চোখের সামনে তুলে যেন ঘুরি পাকাচ্ছেন ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ।

তখনই সপ্রতিভ হয় চক্রবর্তী: এখন তো তুমি আমাদের হোস্ট নও ওস্তাদ। আমরা যখন তোমার স্টিমারে যাবো, আলবাৎ খাওয়াবে।

ক্যাপ্টেনের দুই চোখ চক চক করে, 'ইয়ে বাৎ হ্যায়? তবে আজ রাতেই এসো আমার ট্যাগে, দোস্তকে সঙ্গে আনবে। বহুৎ খানা পিনা হবে, গল্প হবে। ইউ উইল টেস্ট হোয়াট ইজ লাইফ।'

'…হোয়াট ইজ লাইফ!'—শব্দ ক'টা যেন ঈষৎ বিষাদগ্রস্ত। এতক্ষণে ক্যাপ্টেনের চোখে বিষাদ ও মমতা দেখছি। এতক্ষণে মনে হচ্ছে, মানুষটার বুকে ও মস্তিষ্কে অনেক স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা।

চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় তোমার ট্যাগ?'

'জেটিতে।'

'কখন আসবো?'

'এনি টাইম দিস নাইট।'

'আজ রাতেই আসতে বলছো?

'হোয়াই নট? আকাশে কত বড় চাঁদ ভাসছে, দেখ না? রাত হতে বাড়বে, চাঁদ যত বড় হবে, ততই ওর গা থেকে একধরণের গোলাপী আভা বের হবে। চাইলে, আমার ট্যাগ বাঁই বাঁই ছুটবে ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের দিকে। কি মশাই, ফুর্তি হচ্ছে না?'

ভুরু নাচিয়ে পেঁয়াজের শেকড়ের মতন লোমযুক্ত হাতখানা আমার দিকেই বাড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, বকলস লাগানো বেঢপ জুতো সমেত ডান পাখানা ও ঠুকে দিলেন মেঝেতে।

আমি সলজ্জ হাসি।

চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ায়, ডোরাকাটা প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে, 'তবে ঐ কথাই রইলো, আমরা তুরন্ত যাচ্ছি তোমার ট্যাগে।

ক্যাপ্টেন সেই হাত তোলা অবস্থাতেই, 'জরুর। মেরা হাসিনাও ইন্তেজার করবে।'

চকিতে চক্রবর্তী ঘুরে তাকিয়ে চোখ টেপে, আমাকে একরকম

বগলদাবা ক'রে বেরিয়ে আসে বাইরে। সুড়কি ঢালা পথটুকু পার হচ্ছি পা। ঘষটে ঘষটে ও হিম মস্তিষ্কে। এই পথটুকু ঘুরে বা দিকে চক্রবর্তীর গাড়ী পার্ক করা, যার গায়ে চাঁদের আলো চিক চিক করে, যাকে দেখায় অনিবার্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জড়ভরত। চক্রবর্তী ঘড়ি দেখে কব্জির—কম নয়, রাত সাড়ে আটটা। সামনে কালো সরীসৃপ রাস্তা, পেছনে—বার পিয়ার্সের ধূসর রহস্যময় বালি আর বালি এবং সবশেষে সমুদ্র; মাঝে অনেকখানি প্রকৃতি প্রযত্নে ঝাউবন, মানুষ প্রযত্নে ক্যাকটাসও কেয়াঝাড়।

গাড়ীতে বসে আমার প্রশ্ন: 'হাসিনাটা কে? ক্যাপ্টেনের বেগম?'

চক্রবর্তী [স্টিয়ারিংয়ের উপর ঝুঁকে]: তা বললেও বলতে পারেন, হাসিনা তো প্রায় তাই।

আমি [গাড়ীর আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে]: প্রায় কেন?

চক্রবর্তী [অহেতুক হর্ণ বাজিয়ে]: সব কথা বলতে গেলে ছোটখাটো মহাভারত। বরং, ক্যাপ্টেনের মুখেই শুনবেন।

আমাদের গাড়ীকে ধীর অনুসরণে একটি কালো এ্যাম্বাসাডার, সেটা পেরিয়ে যেতে ছুটন্ত লরীর দীর্ঘ আলোকপাত, চক্রবর্তীর হাতে এখন মেজাজী স্পীড নাই, শরীরটা তার ক্রমশই জড়বস্তু—তান্ত্রিক লোকটা কি এখনই মৈথুনরত সর্প দর্শন করবে?

আমি কিন্তু বলি, 'ক্যাপ্টেন যদি না বলেন?'

উত্তর নাই।

আবার বলি, 'ক্যাপ্টেন কি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গল্প করবেন?'

এবার জবাব আসে, 'বলবে। গল্প সে একটাই করে, এবং সেটা তার প্রেম নিয়ে।'

'প্রেম!'

'শুধু প্রেম নয়, অলৌকিক ব্যাপার ট্যাপার।'

'খুব সাসপেন্সে রাখছেন কিন্তু আমাকে।'

'থাকুন আর ঘণ্টা দেড়েক। তারপর হোস্টের হাত থেকে উত্তেজক গেলাসটা তুলে নিয়ে শুনবেন সেই আশ্চর্য গল্প। আমি এর আগেও একবার শুনেছি। বলতে যখন শুরু করে, গোলাম মহম্মদের তখন একেবারে ভিন্ন পারসোনালিটি। খুব দরদ দিয়ে আত্মসচেতনভাবে সব বলবে।'

'আর ক্যাপ্টেনের হাসিনা?'

স্পষ্টভাষী চক্রবর্তী যেন সামান্য উত্তেজিত হয়, 'ড্যাম ইওর হাসিনা। সব শালীরা বিট্রেয়ার!...'

যাক, ক্যাপ্টেনকে তো দেখলেন, এবার ওর ফিয়াসেকে দেখবেন। বর্ণশংকর মেয়ে! আর যাই হোক, চোস্ত সেকস্!

চক্রবর্তীর সুড়ুৎ করে লালা টানাকে ভালগার মনে হয়। বেচারি নির্ঘাৎ বালিয়াড়িতে ঝাউ বনের নিচে আগুন শরীর করগুপ্তাকে মনে করছে! কিন্তু আচমকা আবার খিক্ খিক করে হেসে ওঠে, 'আপনি তো আবার সুশোভনের বন্ধু। নারী-টারি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিশ্চয় কম।'

'একেবারেই কম'—বলেই ওর মুখের দিকে তাকাই এবং চাউনি দেখে ভয় পাই—চক্রবর্তীর দুই চোখ এখন যথার্থ জন্তুময়।

গাড়ীর গতি কিন্তু বাড়েনি এবং ড্রাইভার হিসাবে চক্রবর্তী সদাসতর্ক। বাজারের দিকটাতে বহু লোকের জটলা, হুলুস্থুল কাণ্ড কিছু একটা নিশ্চয় ঘটে গেছে। আমাদের গাড়ী ভিড় এড়িয়ে যায়। পুরনো এঞ্জিনে গর-গর দুদ্দাড় ধুপধুপ—নানান ধরণের স্পষ্ট-অস্পষ্ট শব্দ। বনেটের ফলকে গাঁথা সিল্কের টুকরোটা উড়ছে ফর ফর করে।

আমার হুঁশ হলো, চক্রবর্তীর ভেতর আবার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই বলি।

'হাসিনা কি বর্ণশংকর ?'

'দেখে তো তাই মনে হয়। স্যর পিয়ার্সের মতন বিদেশী ও আর্মেনিয়ান স্থানীয় মেয়েদের যৌবন চেখে গেছে। তার একটা ফলশ্রুতি নাই ?'

—চক্রবর্তীর গলার স্বর প্রমাণ করে, ভেতরে ভেতরে ইতিমধ্যে সে বেশ উত্তপ্ত। তার কামনা, বাসনা, ক্ষোভ, প্রতিশোধ স্পৃহা —পৃথক পৃথক ভাবে সজীব পদার্থ। প্রতিশোধের বস্তুটিকে দেখতে পেলে হয়তো এই মুহূর্তে গাড়ী থেকে ঝাঁপ দিত।

ঝাঁপ দিতে হলো না।

গাড়ী থেমে গেছে চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে। দু'বার হর্ণ বাজাতেই গেট খুলে যায়—আলোর গম্বুজের নিচে দেখা গেল চক্রবর্তীর দৈত্যকায় কেয়ারটেকার। বাতাসে তার দাড়ি উড়ছে, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে দেখছে আমাদের দু'জনকে। সে যেন কোন ভয়ঙ্কর নাটকের পাত্র। ভাগ্যদোষে ক্ষেত্রচ্যুত হ'য়ে এখানে এসে পড়েছে।...ঘরে ঢুকেই রেডিওর বোতাম ঘুরাই। মালকৌষের ঝংকার—সম্ভবত তামিলনাড়ু সেণ্টার। চক্রবর্তী জানালার পর্দা সরিয়ে চাঁদের মুখ দেখে, আস্তে আস্তে বলে, 'সত্যি, ধীরে ধীরে চাঁদটা গোলাপী হয়ে যাচ্ছে।'

আমি পাতলা স্বরে বলি, 'তাই কি কখনো হয় ?'

চক্রবর্তী ঘুরে দাঁড়ায়, 'হয় না ?'

'না।'

'আমার যে মনে হলো।'

'ছ্যাট ইজ হ্যালুসিনেশান।'

'সারটেনলি নট। আমি মোটেই মানসিক ভারসাম্য হারাই নি।

আমি আর কথা বাড়াই না। টেবিলের ওপর থেকে 'প্রি

মাস্কেটিয়ার্স' উপন্যাসটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকি। মিনিট কয়েক পরে চক্রবর্তী আমার দু'কাঁধে হাত রাখে, নরম গলায় বলে, 'মাইরি, আমার লোভ খুব। একটা মেয়ে আমাকে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এখন নাকি নামী সতী। এক রাতে এই ঘরে মাল খেয়ে মুখে কষায় ফেনা বিজ বিজ করছিল।

সেই মেয়ে, যার নাম 'সুচন্দা করগুপ্তা।'

আমি বাকশূন্য।

চক্রবর্তী বলে চলে, 'আর একদিন দুপুরে ব্রোমাইড জাতীয় ওষুধ খাইয়ে ওর শরীরে ডুব দিয়েছিলাম।' এরপরই সেক্সপীয়রীয় ট্রাজিক হীরোর মতন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বামশঙ্কর চক্রবর্তী, বেখাপ্পা হেসেও ওঠে।...তখন গ্যারেজের জ্বলন্ত হ্যাসাগটা নিভিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে কেয়াবটেকার। চক্রবর্তী চাপা স্বরে বলে, 'ঐ লোকটা জানে, সব জানে। ওকে দেখলেই সুচন্দা ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। আমি বলতাম, ভয় পেওনা। চেহারাটা খারাপ হলেও অত ভালো কর্মচারী এ যুগে পাওয়া যায় না।'

নিশিপোকার মতন গুন গুন করতে করতে এক সময় থেমে যায় চক্রবর্তী। তার মুখের রেখাগুলি গভীরতর হয়। অনেকক্ষণ পর বলে, 'চলুন, এবার ডাইনিংরুমে—জাস্ট দু'পিস বাটার পাউরুটি খেয়ে নেবো।'

'চলুন।'

—আমরা দুই সুস্থ মানুষের মতনই এ বাড়ির ডাইনিংরুমে ঢুকি। এতক্ষণ অনেকটা বেহেড মাতালের মতন ব্যবহার করছিল চক্রবর্তী। এখন নিজের হাতেই ব্রেডে বাটার ও সুগার মাখাতে থাকে। আমি আবার বাটার ইচ্ছে করেই বেশী নিই। বলা যায় না, ক্যাপ্টেনের কাছে আকণ্ঠ টেনে বমি-টমির চান্স থাকতে পারে!

খাবার পর গলা বুকের কাঠ-কাঠ ভাবটা আর নাই। পাশের ঘরে এখনো বেতারের উচ্চাঙ্গ ধ্বনিতরঙ্গ। ইতিমধ্যে চক্রবর্তী না

বদলালেও আমি কিন্তু আমার পোশাক বদলে ফেলেছি,—পায়জামা পাঞ্জাবীতে ঢিলেঢালা শরীর, যে বেশে গভীর রাতে আমি প্রায়শই লিখতে বসি অথবা ভায়োলিন বাজাই। এখন অবশ্য ভায়োলিনের উথালপাতাল আমার বুকের মধ্যেই,—কতক্ষণ এই সুন্দর রাতে আমরা সমুদ্রের বুকে চক্কর লাগাবো!···

চক্রবর্তী ও আমি মুখোমুখি চেয়ে পরস্পরকে প্রশ্রয়ের হাসি উপহার দি। এক সঙ্গেই বলি, 'যাওয়া যাক।' বের হবার পূর্ব মুহূর্তে আয়নায় নিজের চেহারাখানা দেখবার চেষ্টা করি। অদ্ভুত দৃষ্টি বিভ্রম! আমি যেন চকিতে দেখলাম ক্যাপ্টেনেরই মুখছবি। তিনি আমাদের বিপুল শক্তিতে আকর্ষণ করছেন ···

এই মাত্র তো তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরছি। আবার মুলাকাৎ হবে, যখন নির্জিব রাত নির্জনতায় খাঁ খাঁ করবে, পোর্টব্লেয়ারের কাঠের বাড়িগুলিতে ঘুণ-পোকার গান শুরু হবে। তখন আমরা মহম্মদের ট্যাগ 'মহল'-এ চেপে ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডের বাতি ঘরের দিকে ছুটবো। খানা-পিনা হবে, জালি চালকুমড়োর মতন পেটটা সামনে বিছিয়ে তাঁর সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা শোনাবেন ক্যাপ্টেন।

রামশঙ্করকে ধন্যবাদ। এ সব যদি ঠিক হয়, আমার আর আক্ষেপ থাকে না।

৫

....

[২০ শে জানুয়ারী। রাত গভীর—গোলাম মহম্মদের গল্প শুরু]

আক্ষেপ নাই।

ছুনিয়ার এক বড় আশ্চর্য জমি হাঁটি হাঁটি ছুটে ছুটে পার হচ্ছি।

সাহেবী পোশাকে রামশঙ্কর চক্রবর্তী, আমি ঢলঢলে পাজামা চিকনের কাজকরা পাঞ্জাবি পরে ছুধের মতন ধব ধবে বালিয়াড়ি পাড়ি দিচ্ছি। যদিও পূর্ণিমা, সমুদ্রের স্ফীতি, গোটা বালুবেলার বিস্তার অনেক, আগাগোড়া ডুবে সমুদ্র হয়ে যায় নি। আমরা হাঁটছি আড়াআড়ি, জোর বাতাস উঠলে বাদায় ঢেউ ভাঙ্গার আওয়াজ বুকের রক্ত হিম করে। বলকারী সমুদ্র পুরাণের স্বাস্থ্যবান শিশু।

চাঁদের শাসনে বালুবেলা অতিক্রম করা—এই এক অনাস্বাদিত নেশা, যার খোয়ারি সহজে ভাঙ্গে না। বালির রং সর্বত্র সমান নয়, কোথাও ঝকঝকে, কোথাও হলুদ হলুদ ফ্যাকাশে। বালির স্তরও সর্বত্র সমান নয়, কোথাও উঁচু কোথাও নিচু; হঠাৎ ঐ রকম একটা চুড়োতে পা দিতেই পা ফস্কে পড়ে যায় চক্রবর্তী। ছু'জনেই হেসে উঠি, চক্রবর্তীর হাসিটা সামান্য করুণ, বলে, 'শালা! আর একটু হলেই কাম আমার ফৌত হয়েছিল!'

কম্বল-কাটা জোব্বা-গোছের জামা পরে কে একজন হন্‌হনিয়ে পেরিয়ে গেল আমাদের। আর আমরা ছুই আনাড়ি সওয়ারি এই পথটুকু পার হতে কত রকমের কসরৎ দেখাচ্ছি।

চক্রবর্তী তার গাড়ী আনে নি। ভালো করেছে। আমরা তো যাবো সমুদ্র বিহারে, গাড়ীটাকে তো আর সফেদ অথবা, ঝুপসি বালিয়াড়িতে ফেলে রাখা যায় না। এখন নিছক হাটা পথে শর্ট কাট মারার জন্য বালির সাম্রাজ্য অতিক্রম করছি আমরা। পূর্ণিমা

রাত—এ সৌন্দর্য অনস্বীকার্য। কপাল, বুক, মেরুদণ্ড ও দুই হাতে থোকা থোকা জ্যোৎস্নার আলো জমাট বেঁধে আছে।

বুঝি কার বিশাল গালিচা পাতা, সেই গালিচার ওপর ইতস্তত দুটি একটি তাকিয়া, অনেকদূরে সমুদ্রের অস্পষ্ট তৈলচিত্র, বাতাসে প্রেমের গান, এখন কোন সাকী গেলাস সাজিয়ে দিলে শেষ রাত অব্দি আমি এখানে ওমর খৈয়াম হয়ে থাকতাম।

চক্রবর্তী এখনো তার পুলওভার, গরম ট্রাউজার ও মোজা থেকে বালি ঝাড়ছে। তার মুখে ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, জ্যোৎস্নায় স্নান সেরে অত্যন্ত প্রসন্ন দুই চোখ।

চক্রবর্তী বালিতে মাখামাখি হবার পর নির্দ্বিধায় ও অক্লেশে আমি খানিকটা পথ ছুটে ঘুরে এলাম, যেন প্রমাণ করতে চাইছি—তোমার চেয়ে আমার সক্ষমতা কত বেশী!

অবশ্য চক্রবর্তীর স্বরে উৎকণ্ঠা: 'এই মশাই, বালিতে ছুটবেন না। হুমড়ি খেয়ে পড়বেন!'

আমি চিৎকার করে বলি: 'পড়লেই বা! এটা যে ঈশ্বরের বাগানবাড়ি।

সাকুল্যে এ রকম বালুবেলা ছিল হয়তো প্রায় মাইল খানেক। তারপর ত্রিভূজাকৃতি জেটি, যেখানে অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের ট্যাগ 'মহল।'…

প্রায় সবটা পথই মেরে এনেছি। সাপের খোলসের মতন পারিপার্শ্বিক ছবিও বদলাচ্ছে, বালিয়াড়ি এখন আর উদ্ধত বুক নয়, ভেজা ও সমতল। সমুদ্রের অবয়বও স্পষ্ট, দাউ দাউ আগুন জ্বলছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। বিভিন্ন ধরণের জলযান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিকে ওদিকে। তাদের আলোগুলি যেন জ্বলছে ছোট ছোট কুলুঙ্গির ভেতর থেকে।

চক্রবর্তীর দিকে চাইতেই সে স্বপ্নালু গলায় ঘোষণা করে: 'চলে এলাম! আমি 'মহল' দেখতে পাচ্ছি।'

'মহল' জাহাজও নয়, আবার লঞ্চও নয়, ট্যাগ। ট্যাগ হলো আয়তনে লঞ্চ ও জাহাজের মাঝামাঝি। লঞ্চের চেয়ে সে শক্ত সমর্থও বটে, গভীর সমুদ্রের ঝঞ্ঝা ও তরঙ্গ সামলাতে পারে। সিঁড়ি বেয়ে মহলে উঠবার মুখেই যেন হোঁচট খাই—কোন নারী কণ্ঠের খিল খিল হাসি শুনতে পেলাম, বাতাসের দাপটে সেই খিল খিল শব্দ কোথায় উড়ে গেল!

দাঁতে দাঁত চেপে চক্রবর্তী বলে, 'হাসিনা!...'

আমার নাকে তেল-কালি-ধোঁয়ার উৎকট গন্ধ। প্রপলারের কাছে টেরিফিক জোরে ভেঙ্গে পড়ছে ঢেউগুলি, সেই হেতু অহরহ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ!

সিগ্রেট ধরাবার জন্য চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ধরাতে পারে না, বার বার চেষ্টাতেও না। যতবার দেশলাই ধরায়, ততবারই সমুদ্রের বাতাস কাঠিটা নিবিয়ে দেয়। শেষে বিরক্ত হয়ে বলে, 'ধ্যাত্ শালা! ক্যাপ্টেনের কেবিনে না ঢুকলে সিগ্রেট ধরানো যাবে না।'

কেবিন তো মোটে একখানা এবং সেটাই ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের আবাস। আরো হতাশার ব্যাপার, ঐ কেবিনটাকেই দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটা ক্যাপ্টেনের পারসোন্যাল এ্যাপার্টমেণ্ট, অন্যটা কিচেন। বাকি খোলা জায়গায়, ফরোয়ার্ড ডেক, টুইন ডেকে অনেকগুলি ক্যাম্বিসের খাট,—যাত্রীরা ওখানেই আশ্রয় নেয়, ঐ খাটগুলিই যেন নাবিকদের ফোকশাল। কে যেন আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বিচিত্র গলায় গান ধরেছে। গান নয়, বিলাপ, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ব্যঙ্গ।

সাধারণভাবে বাতাসের তীব্রতা নাই, কিন্তু সময় সময় দৈবাৎ হু-হু ক'রে ভেড়ে আসে। সমুদ্রের জল চাঁদের আলোয় ঝকমকে। ফসফরাসের আগুনও মালুম হয়। অদূরে সমুদ্রের বা দিকে বেশ কয়েকটা দ্বীপ যেন দুলছে। আধঘুমন্ত খালাসীর গুনগুনানি অদ্ভুত মেলাংকলি।

চক্রবর্তীর যে কী হল, ট্যাগের পাটাতনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে দেখি, ট্যাগের পিছনদিকে একটা লোক যেন অন্যমনস্ক হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। যদিও সে আমাদের দিকে পিছন দিয়ে, দেখেই খটকা লাগে। চকিতে মনে আসে, জোলা পরা ঐ লোকটাই তো কিছুক্ষণ আগে হন্‌হনিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল!

প্রপলারের কাছে বসে কি করছে সে? এত রাতেও কি সমুদ্রে মাছ ধরা হয়? হয়তো তাই। গতকাল পোর্টব্লেয়ার মার্কেটে দেড়মন ওজনের একটা ভোলা মাছের আমদানী হয়েছিল, সমুদ্র থেকে বঁড়শি গেঁথে তোলা।

চক্রবর্তী তাকেই সামান্য অসহিষ্ণু গলায় হাঁক দিয়ে বলে, 'এই, শুনছো?'

সতর্ক ও বিস্ময়পূর্ণ চোখে সে ঘুরে তাকায়। বুড়ো মানুষ, খড়্গা নাক, চাঁদের আলোতে নাকের মাথাটা লাল লাল।

হাটু দিয়ে গুঁতো মারার ভঙ্গিতে নিঃশব্দে সে আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়।

'ক্যাপ্টেন কোথায়?'

সে তার নীল শিরায় ফাটা ফাটা হাত তুলে কেবিনটা দেখায়।

'ক্যাপ্টেন কি করছেন?'

জবাব আসে ভাঙা খনখনে গলায়, 'খানা-পিনার ইন্তেজাম করছেন।'

বলেই সে স্বস্থানে প্রস্থান করে।

'মহল' পূর্ণিমা রাতে উজ্জ্বল, আগাগোড়া দৃষ্টিগোচর হয়, এখানে বাহুল্য না থাকলেও ব্যবস্থা আছে সব রকমেরই। বাতিগুলি জ্বলছে মোমবাতির মতন; ক্যাম্বিসের খাটগুলিতে অনেকেই টান টান কম্বল মুড়ি দিয়ে।

কাঠের পাটাতনে রীতিমত শব্দ তুলে আমরা কেবিনের কাছা-

কাছি।···কিচেনের জানালা মারফৎ চকিতে নজরে আসে, লম্বা জুলফি ক্ষুদে চেহারার একটা লোক আমাদের দিকে পিছন ফিরে টেবিলেব ওপর রাশি রাশি কাপ-ডিশ সাজিয়ে রাখছে; ঐ সব কাপডিশ ছাড়া টেবিলে রয়েছে জেলি-পাউরুটি, সেদ্ধ-ডিম, আধখানা কলার কাঁদি, কুচি কুচি নারকেল, টুকরো টুকরো আপেল···। আমার বাসনা, ঐ ইত্যাকার সফিস্টিকেটেড্ খানাগুলি আঁকড়ে টেবিলটার সামনে একা বসে থাকি। বহুক্ষণ বালুবেলায় দাপাদাপি করাতে উঠতি ভুঁড়ি চুপসে আছে, পিঠ, কোমর ও পায়ে বেশ ব্যথা।

কেবিনের দরজা ভেজানো। চক্রবর্তী তাতে হাত রাখে। সামুদ্রিক বাতাসের গোঙানি বাড়ছে। কোত্থেকে একখণ্ড কালো মেঘ চাঁদের আধখানা গ্রাস করে। আমার শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে লোনা হাওয়া বুকের মধ্যে বাসা বাঁধছে। ঠাণ্ডা হাতটা আবছা আলোতে মেলে ধরি এবং তখন শুনতে পাই, চক্রবর্তী ডাকছে, 'ক্যাপ্টেন, জেগে আছো?'

ক্যাপ্টেন এমন গলায় সাড়া দিলেন, যেন তাঁর ঠোঁটের একপাশে লেগে আছে সিগ্রেটের টুকরো এবং ধোঁয়া এসে জ্বালা ধরিয়েছে চোখে, 'আসাত আজ্ঞা হয়। ক্যাপ্টেনরা বাতে ঘুমায না!'

দরজা ঠেলে কিন্তু দেখি, ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে সিগ্রেট নাই, চুরুটটা পুড়ছে অন্যত্র। কেবিনের পরিশর যথেষ্ট নয়, একজন কি বড় জোর দু'জন এই পরিশরে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে আয়াস করতে পারে। নিচু বাংকের ওপর অগোছালো বিছানায় সম্রাট শাহজাহানের মতন ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ তাঁর সুন্দরী হাসিনার সোহাগ উপভোগ করছেন।

এ ঘরে যতটুকু আলো, তার যাবতীয় মসৃণতা চুইয়ে নামছে ঐ দু'জনের ওপর।

অন্যত্র আবছা অন্ধকার, বাল্বের মধ্যে যেন শুধু ফিলামেণ্টই

জ্বলছে। একটা বিশাল মথ ঐ আলোতেই আকৃষ্ট হয়ে তার পাখা কাঁপাচ্ছে।

ভাঙা ভাঙা মোটা গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমরা তবে সত্যি এলে।...আমি এতক্ষণ চোখ বুজে বুজে এ্যালবাট্রস পাখি আর ডলফিনের ঝাঁক দেখছিলাম। বার পিয়ার্সের নেশাটা সবে ফর্সা হলো। ফের শুরু হবে—'

খালি তিনটে চেয়ারের দু'খানা আমরা দখল করি। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে নিরিবিলি শান্ত রূপালী সমুদ্রকে দেখা যায়। গোটা জলযানটাতেই কোন চাঞ্চল্য নাই,—এঞ্জিনরুপে এলার্ম বাজে না, কম্পাস রিডিং অচল, চারদিকে নিছক সাদা জ্যোৎস্না, সমুদ্রের তুখোড় শয়তানটা ঘুমিয়ে আছে।

'সি ইজ মাই হাসিনা।'

—হাত বাড়িয়ে পিঙ্গলা সুন্দরীকে বুকের ওপর টেনে ক্যাপ্টেন বললেন।

সত্যি বলতে কি, একরাশ সাদা ধোঁয়ায় যেন আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। পাহাড়প্রমাণ আমার বিহ্বলতা। এ রকম দৃশ্য প্রকাশ্যে কোনদিন দেখিনি। রীতিমত ঝাঁজালো ব্যাপার। অনভ্যাসজনিত লজ্জা, তাই প্রথমে চোরাচোখে এবং কিছু পরে সরাসরিই তাকাই,—গোলাম মহম্মদের সঙ্গিনীর মঙ্গোলিয়ান চোখ-নাক, লালচে রং, ঠোঁটের ওপরে আঁচিলটাও ঠিক কালো নয়, অসাধারণ যৌবনবতী, স্বল্প ও স্বচ্ছবসনা, যার নির্লোম জানুর ওপর ক্যাপ্টেনের অতিকায় মাথাটা কাৎ হয়ে আছে, ক্যাপ্টেনের উদোম লোমশ বুকে যার টেবা টেবা আঙুলগুলি সঞ্চরণরত, যার বুকের ছাঁদ ও পাছা-উরুর বিস্তারে আমার শরীর শির শির করে ওঠে। এই ক্যাপ্টেনের হাসিনা,—নির্বিকার দুই উরু বিচিত্র কম্পনের উৎস।

'আমাদের সেলাম নিন, আমরা ক্যাপ্টেনের দোস্ত।'

—চক্রবর্তী যেন খানিকটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলে সুন্দরীকে। হাসিনার দুই চোখে হাসির চাকচিক্য, আমি যাতে বিদ্যুতের সন্ধান পাই। ক্যাপ্টেনের মতন একজন মধ্যবয়সী লোক কি ভাবে যে…! হাসিনাকে বুকের কাছে জাপটে রেখেই গোলাম মহম্মদ খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রকে দেখেন; বললেন, 'বহুদিন পর এমন মধুর জ্যোৎস্না নেমেছে সমুদ্রে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এখনো বেশ শীত শীত। ঠাণ্ডা বাতাস কেমন অল্প অল্প উঠে আসছে!'

—ক্যাপ্টেনের গলায় আকস্মিক ছন্দময় কবিত্ব। হাত ঘষছেন হাসিনার মসৃণ ঘাড়ে। মাংকি ক্যাপটা খুলে রাখাতে, এই শীত শীত সন্ধ্যায় নিরাবরণ বুক চিতিয়ে রাখায় ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের যৌবনের পড়ন্তকাল খুব প্রকট।

'কখন জাহাজ ছাড়বেন!'

—কিছুক্ষণ উসখুস করবার পর কোন রকমে প্রাসঙ্গিক কথা আমিই সুরু করি।

গোলাম মহম্মদ ব্যস্তভাবে মাথা নাড়তে থাকেন, 'গুস্তাফি মাফ করবেন। আজ রাতে আর 'মহল' চলবে না।' পলকের জন্য সোজা হয় চক্রবর্তী, 'কেন হে? সমুদ্রে ঘুরবো বলেই তো এতটা পথ ঠেঙিয়ে এলাম।' বিছানার নিচে পাতা হোল্ডঅলের হলুদ সুতো আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'সবই নসীব। সকলকে ছুটি দিতে হলো। সারেঙ মাছ ধরছে, সুকানী ব্যাটা মাল খেয়ে গান ধরেছে!'

ক্যাপ্টেনের কথায় উদ্বেগাকীর্ণ আমি জনশূন্য প্যাসেঞ্জটার দিকে তাকাই ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি। কিছুটা হতভম্ব চক্রবর্তীও। ক্যাপ্টেনের চোখে অবশ্য কোন পেশাদারী ধূর্ততা নাই। বরং, ডান-হাতি জানালাটায় পায়ের বুড়ো আঙুলের ধাক্কা দিয়ে দরাজ গলায় বললেন, 'মুসাফির, গোসা করবেন না। কাল জরুর আমার ট্যাগ আপনাদের সমুদ্র দেখাতে নিয়ে যাবে। বাঁদীর বাচ্চাদের

ছুটি না দিয়ে পারলুন না।···আস্থন না, জাহাজ্ না চলুক, খানা-পিনা হবে।'

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হতেই বাহারী ক্যালেণ্ডারের ছবির মতন খিল খিল করে হেসে ওঠে সুন্দরী, 'খানা হবে জরুর ; লেকিন পিনা কিউ ?'

ক্যাপ্টেন ওর গালে টোকা মারেন, 'পিনা হবে না তো দিলকা তাগদ্ পাবো কোত্থেকে ?'

'মেরে বুলবুল, তুমি চোখ বুজে খোয়াব দেখো। আমি দোস্তদের সঙ্গে বাত্চিৎ করি।'

বলতে বলতে বালিশের ওয়াড় খামচে বেমক্কা চুমু খাওয়া। আমাদের উপস্থিতি এতটুকু গ্রাহ্য করছে না ওরা! শিউড়ে উঠি। মনের মধ্যে সংস্কার ও লজ্জার যত ঝুল-কালি, ক্যাপ্টেন ও তাঁর হাসিনার কাণ্ডকারখানায় সব ফালা ফালা। চোখের সামনে এমন ব্যাকুল প্রেম-সংকুল দৃশ্য আমার সহ্য হলে হয়! আল্লার ছুনিয়ায় এইসব আজব জীবরাও আছে!

যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, যতই না কেন আড়ষ্ট বোধ করি, তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নাই। এক-আধবার অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলছেও তারা। ক্যাপ্টেন তাঁর হাসিনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তারচেয়েও আশ্চর্য, সেই আবেগে সমভাবে সাড়া দিতে যুবতী বিমূঢ় নয়, তার কোন বিকার নাই!

গোলাম মহম্মদ কিন্তু আমাদের অপ্রস্তুত করলেও ঠিক উপেক্ষা করছেন না। তাঁর এক চোখ আমাদের দিকে অন্যচোখ যুবতীর দিকে। আমার মনে হলো, ছুটো বিপরীত ধর্ম বস্তুকে একই সঙ্গে স্পর্শ করছেন তিনি।

কাঠের চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে লক্ষ্য করছি।

হঠাৎ শশব্যস্তে উঠে বসেন ক্যাপ্টেন ; বাংক থেকে নেমে গায়ে একটা জামা গলান, তারপর তিন নম্বর চেয়ার দখল করে সবেগে

বেল বাজালেন। এই তৎপরতা তথা এই বেলের আকস্মিক আর্তনাদে আর সকলের সঙ্গে হাসিনাও খানিকটা হকচকিয়ে যায়; এই প্রথম সুন্দরীর ভিতর ইতস্তত। ও কুণ্ঠা লক্ষনীয়। সে তার বসন ও দেহকে সংযত করে ক্যাপ্টেনেরই পরিত্যক্ত বালিশে মাথা রাখে।

ক্যাপ্টেন বেল বাজালেন।

আমরা যেন সামান্য সন্দিগ্ধ।

কিচেনের দরজা ঠেলে আবির্ভূত হলো কিম্ভূতদর্শন এক আগন্তুক, যে দু'পলক আমাদের, ক্যাপ্টেনকে ও শায়িতা হাসিনাকে দেখে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়।

লোকটার মুখেব দিকে চেয়ে প্রবল আতঙ্ক ও ঘৃণা। মানুষ এমন কুৎসিৎ হয়। সম্ভবতঃ জাগুয়া উপজাতিভুক্ত। এই রাতের বয়স বাড়িয়ে দুর্যোগের বার্তা বয়ে এনেছে যেন। চোখ দুটি নিষ্পলক। হাতে তার তিনটে চক চকে গেলাস, দুটো সোডার বোতল এবং ওল্ডমঙ্কের বড় সড একটা বোতল, দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে হাতে কি করে যে এতগুলি বস্তু ধরে আছে, বোধবুদ্ধির অগম্য।

সে ক্যাপ্টেনের কিচেন মাষ্টার। রীতিমত পিগমী-টাইপের বামনবীর, কুৎসিৎ লোমশ শরীরের ওপর ধব ধবে জামা-প্যাণ্ট। মুখময় বসন্তের ক্ষত, পুরু ঠোটের কোনে আবার জ্বলন্ত সিগ্রেট,—ধোঁয়ার রেখাগুলি বুঝি ওর মুখেরই চারপাশে জমাট বেঁধে আছে। চকিতে মনে হয়, ঠোটের কোনে ঐ সিগ্রেটের টুকরোটাই ওর ভাবমূর্তিকে আরো কদর্য ও শয়তান ক'বে রেখেছে।

সে চুপচাপ গ্লাসে গ্লাসে পরিমান মত রাম ঢালে, সোডা মেশায়। তার যান্ত্রিক নিপুনতার কোন কৈফিয়ৎ নাই; অতটুকু শরীর নিয়েই সে নিজের আত্মপক্ষকে ক্রমশই বড় ক'রে তুলছে। অজস্র প্রশ্ন

আমার মনে, অপ্রসন্ন দৃষ্টি তার মুখের ওপর। চক্রবর্তীও কেমন যেন শঙ্কিত অথবা অপ্রতিভ। সমুদ্রের গর্জন বাড়ছে। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েও সময়টা ঠিক ঠাওর করতে পারছি না। বাংকের ওপর সুন্দরী এখন সামাজিকভাবে শালীন হয়েছে, কাত্ হ'য়ে ঢুলু ঢুলু চোখে এদিকেই চেয়ে আছে। চক্রবর্তী তার গলার খুসখুসানিতে বার দুয়েক কেশে ওঠে।

'আমার গেলাসে এখন আর নয় বোথা। প্রচুর মাল এখনো পেটে জমে আছে। রয়ে-সয়ে খেতে হবে!' গোলাম মহম্মদ তাঁর দুই হাত মাথার পিছনে রেখে স্পষ্ট ও সরস গলায় বললেন।

বোথার অবশ্য প্রত্যুত্তরে কোন সাড়াশব্দ নাই। নিঃশব্দে দুটো গেলাস আমাদের দু'জনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। তারপরেই আবার পিছন ফিরে কিচেনে চলে যায়।

অস্বস্তির প্রবলতা কাটিয়ে বুকভরে দম নিই; চক্রবর্তীর নতুন প্যাকেট থেকে সিগ্রেট ধরাই। চক্রবর্তীও দুর্বলভাবে কি একটা সুর ভাজবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাতেই আমি আবার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় দুলে উঠি। উনি একদৃষ্টিতে আমার দিকেই চেয়ে আছেন। এক নাগাড়ে চেয়ে থাকা এক জোড়া গভীর দৃষ্টি।

চোখা চোখি হতেই ধাক্কা খেলাম, ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমার কিচেন-মাষ্টারকে দেখে কি আপনার ভেতর ঘৃণা জাগছে?'

এ যেন এক অতি স্পষ্ট আক্রমণ। যেন এক ঝলক সার্চ-লাইট এসে পড়লো আমার মুখের ওপর। অস্বস্তি ও জ্বালায় ছটফটিয়ে উঠি, অনেকটা বিব্রত স্বরে বলি, 'না-না ঘৃণা নয়; তবে ওরকম অদ্ভুত চেহারার লোক আমি কখনো দেখিনি; বিশেষতঃ এই রাতে—'

কথাটাকে নাটকীয় কায়দায় লুফে নিলেন ক্যাপ্টেন, 'বিশেষতঃ এই রাতে ও বড় বেমানান, তাই নয়? সে যাই হোক, আমার কাছে কিন্তু বোথার মূল্য অনেক। বিশ্বাসী, শান্ত ও কর্মনিপুন।'

স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়েই ক্যাপ্টেন তাঁর কিচেন-মাষ্টারের গুণ্‌ বর্ণনা করছেন, তাঁর গলার স্বরও ক্রমে স্নেহার্দ্র হতে থাকে, 'বোথা শুধু কুক নয়, হি ইজ অলসো মাই ওয়েল-উইশার। তুনিয়ায় যখন স্কাউন্‌ড্রেলদের সংখ্যাই বেশী, তখন ঐ রকম একজন লোক পাওয়া কি ভাগ্যের কথা নয়? ওর বোধবুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়; পানীয়র টেবিলে ওর মতন নিপুন লোক সচরাচর দেখা যায় না।...'

বোথাকে নিয়ে এমন দীর্ঘ ব্যাখ্যা যেন অনভিপ্রেত ও মাত্রাতিরিক্ত। বরং মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেন যেন বোথা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার আপ্রাণ চেষ্টাতেই কথাগুলি উচ্চারণ করছেন। তাঁর মতন উজ্জ্বল মানুষের মুখে শব্দগুলিকে বিমর্ষ মনে হয়।

আমি আমার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিই। হাতের কাছে তিনটি গেলাসে সোডার বুড়বুড়ি উঠছে। ক্যাপ্টেন একটা গেলাস তুলেই ঘোষণা করলেন: চিয়ার্স!

সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গেলাস তুলে ঠোকাঠুকি করি: চিয়ার্স।

এক ঢোঁক গিলতেই গলার ভেতর জ্বলুনি, বুকের হাঁসফাঁসানি। পুরনো ও দামী মাল নিঃসন্দেহে।

প্রথম চুমুকে কখনো রক্তের হাওয়া বদলায় না, কিন্তু মানসিক অবসাদ কেটে যাবার বিন্দু বিন্দু সম্ভাবনা দেখা দেয়; বিশেষত এই মুহূর্তে আমি যেন এক রেচেড অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, আজ রাতে যদি ক্যাপ্টেন তাঁর অতিথিদের এই পানীয়টুকু না দিতেন, আমার ভেতর অনিবার্যভাবেই অক্ষম হিংস্রতা ও ঘৃণা এসে বাসা বাঁধতো। অবশ্য আমি সহবতে রপ্ত, পারত পক্ষে কাউকে সরাসরি আঘাত করি না।

চোখ তুলে ক্যাপ্টেনের কেবিনটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। বৈশিষ্ট্যহীন ঘর। খুব নিচুস্বরে উচ্চারণ করি—'ইট হ্যাজ নো ডিজাইন!' খয়েরী রংয়ের কাঠের খিলান, কার দুর্বুদ্ধিতে তার

আবার জায়গায় জায়গায় সাদা সাদা ছোপ, পিন পিন করে গোটা কতক ক্ষুদে পোকা উড়ছে…টুকি-টাকি অনেক কিছুই ঝুলছে, যথা, যূঁই ফুলের ছবি আঁকা ক্যালেণ্ডার, হ্যাঙ্গারে জামা-প্যাণ্ট, নীল টুপি ইস্তক কত কি…সর্বোপরি, কোনায় কোনায় ঝুল-টুলও রয়েছে; আমি একটা ডিমপেটে মাকড়সাকে দেখতে পাচ্ছি, যে সামান্য থেমে সুর সুর ক'রে হাঁটতে শুরু করেছে, হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা জায়গায় থমকে দাঁড়ায়, যেখানে আমারও দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ। সেখানে ঝুলছে একটা বিচিত্র ধরণের অস্ত্র। এতক্ষণে আবিষ্কারের ফুরসত হলো—ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঝুলন্ত বিজাতীয় হাতিয়ার! আমার উর্ধ্বমুখ অন্যমনস্ক চোখ সচেতন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমি ঐ জিনিসটার গড়ন ও গঠন নিয়ে মনে মনে চর্চা শুরু করে দিই। সম্ভবত ওটা মিশ্র ধাতুর, বাটটা বাটির মতন এবং আয়তনে বাটটাই মূল অস্ত্রের চেয়ে বড়। বস্তুটি সম্পর্কে এখন আর সন্দিগ্ধ হবার কারণ দেখিনা, কেননা স্পষ্টই বহুকালের অব্যবহারে পুরু হয়ে ধুলো জমেছে, যদিও মরচে ধরেনি ধাতুর গুনে।

জিজ্ঞেস করি, 'ওটা কি ক্যাপ্টেন?'

যেন এই প্রশ্নটার জন্য উৎকর্ণ ছিলেন গোলাম মহম্মদ নয়, রামশঙ্কর চক্রবর্তী; চটপট বলে ওঠে, 'দেখে বুঝতে পারছেন না? ওটা এক ধরণের হাতিয়ার। কোকোদ্বীপের বাসিন্দারা বলে বটুয়া।'

খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা অবচেতনা নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। যেন চোরের মতন সন্তর্পণে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে বটুয়াটা পরখ করতে থাকি। বিশেষ কোন অভিসন্ধি নাই, তবু আঙুল ঘঁষে ওর ধুলোর আস্তরটা সরাই—ইস, একেবারে আয়নার মতন চকচকে! অনায়াসে নিজের মুখ দেখা যায়। ভারী খুব, ধার-টার বিশেষ কিছুই নাই। ক্যাপ্টেনের এটা আর এখন কি কাজে লাগে? বরং, ক্যাপ্টেন যদি এটা আমায় প্রেজেণ্ট করতেন,

আমার আন্দামান প্রবাসের স্মৃতি হিসাবে পাঁচজনকে জিনিসটা দেখাতাম।···না, না, ছি-ছি, এ সব কি ভাবছি। খুবই ছেলেমানুষী ভাবনা! আমার ভেতরকার পরিণত গাম্ভীর্যটা মার খাচ্ছে।··· এটি একটি অচল বস্তু।

হালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে সব চাকু বিশারদদের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা হয়তো এমন একটি মারণাস্ত্র দেখে দাঁত বের করে হি-হি করে হাসবে। এ জিনিস দেখে ভয়ে কারুর মুখ নিরক্ত হবে না। এমন অস্ত্র, যা দিয়ে গলা কাটা যায় না, ভুঁড়িও ফাঁসানো সম্ভব নয়। তবু—

তবু অস্বীকার করবো না, বস্তুটি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় ঠেকছে। কেন কে জানে!

বুকের মধ্যে একটা লোভাতুর পোকা চার হাত-পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

'স্যর, ওটা কোন বিখ্যাত স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীর স্মৃতি নয়। কোকোদ্বীপের এক আদিবাসী সর্দার উপহার দিয়েছিলেন', আমাকে জানিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'সর্দারের কচি মেয়েকে সমুদ্র থেকে বাঁচিয়েছিলাম; তজ্জনিত পুরস্কার।'

আমি আবার ফিরে আসি চেয়ারে, টেবিলের সামনে। ইতিমধ্যে কখন যেন নিঃশব্দে বোথা একটি লেমনেডের ট্রে রেখে গেছে। যদি ইচ্ছে হয়, সোডার বদলে লেমনেডের ব্যবহার করতে পারি আমরা।

তিনজনে একই সঙ্গে গেলাস তুলে পানীয় গলায় ঢালি। তারপর আর একবার। প্রথম রাউণ্ড শেষ।

গেলাস ফর্সা। ঈষৎ ঘোর লাগছে টের পাচ্ছি। চোখের সামনে থোকা থোকা অন্ধকার বাদুড়ের মতন ঝুলছে। অদূরে শায়িতা সুন্দরীর উরুর ভ্যাপসা গন্ধ পাচ্ছি যেন। এইসময় হঠাৎ

আমায় কবিতার বাতিকে পেয়ে বসে; যদিও পদ্য লিখিনা, প্রিয় কবির স্তবক অনায়াসে আবৃত্তি করি :

বৃষ্টি নেই হাওয়া নেই আপাততঃ পৃথিবী নীরব।
জানালায় শঙ্খমালা সমুদ্রের গ্রীবা
দেয়ালে বিরস নীল গলিত গন্ধের স্রোত শব
ছুঁয়ো আছো চন্দ্রমল্লী, পৃথিবীর অমর বিধবা।*

জানলার গরাদ টপকে ঝলক ঝলক বাতাস আসে, ক্যাপ্টেন তাঁর মোটা জিনের প্যান্টে হাত ঘষেন; লোকটার ভেতর যেন শ্রেণীবৈষম্যবোধ নাই, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন, কখন বোথা এসে আবার আমাদের গেলাস পূর্ণ করে দেবে। এই সব সুখাতিসুখ ব্যাপারগুলি ওল্ড মঙ্কের কৃপায় ক্রমশই আমার কাছে প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠছে।

'মহল'-এর ক্যাপ্টেন আবার ঐ অস্ত্রের প্রসঙ্গে স্মৃতি টানেন, '...কচি মেয়ে সমুদ্রের ধারে মার্বেল রঙ ঝিনুক কুড়াচ্ছিলো। হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ তাকে টেনে নিয়ে যায়। আমি সে সময় বালু-বেলাতেই রোদ পোহাচ্ছি। চিৎকার শুনে ঝাঁপিয়ে পড়ি সমুদ্রে। অবশ্য আমার অমন ব্যস্ত না হলেও চলতো; সমুদ্র তো অত সহজে কিছু নেয় না, রসিকতা করে মাত্র। পাল্টা ঢেউ বাচ্চাটাকে একেবারে আমার কোলে তুলে দিল। অথচ, সর্দারের ধারণা, আমিই তাঁর মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছি। সে কী খাতির গো! কুঁড়েতে নিয়ে গিয়ে এক কাঁদি কলা, আর গোটা পঞ্চাশেক ঝুনো নারকেল ভেট দিলেন। সঙ্গে ঐ বটুয়াটাও। আরো একটা বস্তু দিতে চেয়েছিলেন মাইরি—'

বলেই ক্যাপ্টেন চোখ টিপলেন, নিচু গলায় বললেন, 'এক রাতের

---

* পাখি—শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

জন্য একটা আদিবাসী মেয়েকেও পেতে পারতুম। আমি রাজি হইনি।'

যেন ছ্যাঁকা খেয়েছে, এমন চমকে ওঠে চক্রবর্তী; জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলে, 'কেন হে? আদিবাসীদের শুনেছি রোগ-টোগ থাকে না।'

ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি উদাস হয়, কপালের রগটা কালশিটের মতন কালো ও ফুলে ওঠে, দুই হাঁটুর ওপর দুই হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, 'রোগ আদিবাসিনীর ছিল না, ছিল আমার। মনের রোগ, প্রেমের রোগ, ভালোবাসার কামড়। মন যখন সম্পূর্ণই একজনের কাছে বাঁধা, অপরের দেহ ছানতে কি তখন ইচ্ছা করে?'

আমি কিন্তু সেই বটুয়াটার দিকেই চেয়ে আছি। অস্ত্রটা দিয়ে এখন হয়তো একটা মুরগী জবাইও চলে না। এককালে নিশ্চয় ধার ছিল। কত পশু-পাখির হাড্ডিগুড্ডি এক কোপে···। সবচেয়ে লক্ষণীয়, ওর নির্মাণ-কৌশল। আদিবাসীদের অস্ত্র বলতে আমি তীর-ধনুক, বর্শা-টর্শাই বুঝি, বটুয়া-টটুয়ার কোনদিন নাম শুনিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় অস্ত্রের বিবর্তন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম, খান কতক বই ঘাঁটতে হয়েছিল—বটুয়ার নাম বা, ছবি কিছুই দেখেছি বলে মনে হয় না।

আপন মনেই বলে উঠি, 'পুরস্কারটা লোভনীয়।'

ক্যাপ্টেন যেন আমার বাসনার হদিশ পান, তাঁর স্বরও কঠিন হয়, 'অস্ত্র হিসাবে ওটার দাম কানাকড়িও নয় সাহেব! মানুষের দাঁত আর নখই হলো সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার।'

একটু থেমে আবার বলেন, 'তবু আমি কিন্তু ওটি হাজার টাকার বিনিময়েও বেচতে পারি না।'

'আমারও তাই অভিমত', চক্রবর্তী যেন পুঞ্জীভূত আবেগে কেঁপে ওঠে, 'ওটা হস্তান্তর করা তোমার পক্ষে অপরাধ।'

আমি বলি, 'কেন ওর পেছনে কি আরো বিশেষ কোন স্মৃতি আছে?'

উৎসাহে টেবিল চাপড়ায় চক্রবর্তী, 'আছে, আছে, আর সেখানেই তো গল্পের শুরু।'

'ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের প্রেম। একমেবাদ্বিতীয়ম্। দুনিয় রসাতলে যেতে পারে, আমার আপনার হাতের তেলোয় চুল গজাতে পারে, কিন্তু প্রেমিক গোলাম মহম্মদের কোন বিচ্যুতি ঘটবে না।'

চক্রবর্তী এমন ভাবে বললো, যেন ঐ কথাগুলিই বলবার জন্য সে এক বিশেষ অধিকারবোধ অর্জন করেছে। আমার কিছু সন্দেহ হয়, আমরা তিনজনই অল্প-বিস্তর নেশাগ্রস্ত।

বোধা আবার আর এক প্রস্থ গেলাস পূর্ণ করবার পর তিনজোড় সতৃষ্ণ চোখ ঘুরে-ফিরে তিনটি বিন্দুতে এসে একাত্ম হয়ে যায়।

ক্যাপ্টেন গেলাস তুললেন, রঙিন পানীয়র দিকে চেয়ে করুণ হাসি হাসলেন, এক ঢোক খেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'চক্রবর্তী আবার আমার সেই দুর্বল জায়গাতেই হাত রাখলে? খালাসীর রাগ যত বড়, প্রেমও তত দড়।'

চক্রবর্তী ঘুমন্ত গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'ওস্তাদ, তুমি যাকে দুর্বলতা বলছো, ওটাই তো সবলতা। আমার কথাই ধরো—মাইরি আমি কোনদিন কোন মেয়েকে ভালোবাসতে পারবো না। শালা পাথর বনে গেছি। বুকের মধ্যে খাঁ-খাঁ মরুভূমি। তোমার মতো নরম মন আমার নাই। আমি শালা কুকুরের মতন পাঁচটাকে চেখে বেড়াই, কাউকে ভালোবাসতে পারি না।'

চক্রবর্তী নিজের বুকে কিল মেরে দুঃখ জানায়।

বিচলিত ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীর কাঁধের কাছটা হাতড়াতে থাকেন 'আরে ইয়ার, মহব্বৎ তোমার কলিজাতেও বহুত ছিল।—'

'না, ওস্তাদ, তোমার মতন নয়!'

দুই প্রেমিকের দিল খোলা হাহাশ্বাসে নিঃঝুম রাত হকচকিয়ে গেছে। গেলাসটা নামিয়ে আমি বলি, 'আই এ্যাম ইন ডার্ক

আমাকে অন্ধকারে রেখে দিব্যি আপনারা বিলাপ করছেন। আমি জানলামই না, কি প্রেম, কিসের প্রেম, কেন আপনাদের এত যন্ত্রণা।'

চক্রবর্তী ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'ঠিক কথা, সেনগুপ্ত ইজ ইন ডার্ক। টেল হিম, তুমি ওকে বলো। ও আবার লেখক। অলৌকিক প্রেমের গল্প ফাঁদতে পারবে।'

'শোনাবো। রাতের বয়স আর একটু বাড়ুক।'

—বিমর্ষ গোলাম মহম্মদ গেলাস তুলে থার্ড রাউণ্ড শেষ করলেন।···

থার্ড রাউণ্ডের পর ফোর্থ রাউণ্ড, ফোর্থের পর ফিফ্থ। আমি আর সেই ব্যাঙ্ক-কেরানী শেখর সেনগুপ্ত নই। আমার মগজের ধারে-কাছে কলেজ স্ট্রীটের কোন প্রকাশক নাই। বৌদি, দাদা, সুশোভন, রেবা··· এরা কেউই আমার কাছে আসছে না। আমি একা। চোখের পাতা বন্ধ করি, খুলি। বন্ধ করতেই দেখি, সামুদ্রিক উপকণ্ঠে গাছগাছালি। গাছগাছালির মাথায় মাথায় পাখিদের মেলা। চোখ খুলতেই দেখতে পাই, ক্যাপ্টেনের হাসিনাকে। হাসিনা আমাদের দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছে, এ্যালকহলিক গন্ধে সুন্দরী বুঝি ঘুমিয়ে আছে। আহঃ! পাছার কী বিশাল বিস্তার। হে আধবুড়ো ক্যাপ্টেন, আমি রোজ তোমার অনুকারী সঙ্গী হয়ে এইসব দেখে যাবো!···

ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ বড় উদাসীন আর গম্ভীর। আসলে তিনি বলতে শুরু করেছেন, যেহেতু রাত এখন তার যৌবনকাল অতিক্রম করছে। মানুষের বহমান স্রোতের সাদা গল্প নয়। সমুদ্রের হৃদয় থেকে নিমজ্জিত গুপ্তধন তুলে আনার মতন অলৌকিক ঘটনা। আমি যদিও আমি নই, যদিও আমার দৃষ্টি হাসিনার দেহের বিশেষ বিশেষ অংশ লেহন করছে, আমি কিন্তু উৎকর্ণ,—ঈশ্বরের বাগানবাড়িতে বসে এক ঈশ্বরেরই গল্প শুনছি।

৬

....

[রাতের বয়স মধ্য যৌবন : গোলাম মহম্মদ রূপসীর মুখোমুখি।]

ট্যাগ 'মহল' নোঙর পেতেছে ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডে।

নিজের গুনে ঝঞ্ঝা ও তরঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহলের গতি আন্দামানের এ-দ্বীপ থেকে সে-দ্বীপ। নদী-নালা নয়, সবটাই সমুদ্র এবং বে-অফ্ বেঙ্গলের দাপট পূর্ণমাত্রায় অনুভূতি। সমুদ্র কখনো প্রশান্ত বিশাল পুরুষ, কখনো কুচ্ছিৎ দজ্জাল মেয়ে।

বাউণ্ডুলে ক্যাপ্টেনের একহাতে খোকা বোতল, অন্যহাতে বায়নাকুলার।

ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের বাতিঘর প্রাক-সন্ধ্যাতেও নিছক ঝাণ্ডা পোঁতা গম্বুজ। আর কিছুক্ষণ পর, যখন আড়কাঠির মতন সন্তর্পণে অন্ধকার সবটুকু আলো নিয়ে চম্পট দেবে, বাতিঘরের বাতি জ্বলে উঠবে—বহুদূর থেকে সমুদ্র-যাত্রীরা পেয়ে যাবে যথার্থ নিশানা।

যাত্রীরা নেমে গেছে একে একে।

গোয়েন্দা পুলিশের মতন সুকানী প্রত্যেকের মুখ ও জিনিস-পত্রের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে, কেউ যেন জাহাজের কোন সম্পত্তি নিয়ে এই বেলা কাট্ না মারে। যাত্রীরা নেমে যাবার পর ক্যাপ্টেন নামলেন। ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ। একা নন, সঙ্গে তাঁর সারেং তথা সাকরেদ শিবপ্রধান।

জাহাজ ঘাটের অদূরে পরিত্যক্ত গল্ফ্ লিঙ্ক্। যেখানে এক কালে দু'চারজন সাহেব সুবোস্টিক হাতে কেরামতি দেখাতেন। এখন ক্রমশই তার পরিশর ছোট হয়ে আসছে, বিন্না-মুথার ঘাসগুলি নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসছে।

শিবপ্রধান ঐ দিকে আঙুল তুলে বলে, 'ঐ মাঠে সাহেবরা তাঁদের মেমদের নিয়ে খেলতে আসতেন। এখন কেউ আসে না।'

ক্যাপ্টেন ম্লান হাসেন, শিবপ্রধানের ঘাড়ে হাত রাখেন।

প্রধানের চেহারাখানা ঠিক ভদ্রলোকের নয়, সামান্য বুনো বুনো। গায়ের রং কয়লা কালো, দাঁতগুলি উঁচু উঁচু, চেহারার মাপে ক্যাপ্টেনের দেড়গুন, বিশেষ এক জাতের দৃঢ়তায় যথেষ্ট মনে হয়, হাতহুটো প্রায়শই হাঁটুর হু'পাশে ঝোলে ও সে ঝুঁকে ঝুঁকে চলে।

নীল আছাড়ি পিছাড়ি সমুদ্রে, ঝাউ আর শাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে অতি তৎপর যে প্রধান, তার পারিবারিক ইতিহাস লোক ডেকে শোনানোর মতন। বাপ ছিল উত্তর প্রদেশের কুখ্যাত সমাজবিরোধী দ্বিগুপ্রধান, এখনো সরকারী দলিলে যার রং-চটা ফটো আছে—রুক্ষ চেহারা, দুই গালে গর্ত, বাঁ চোখের ওপর লড়াইয়ের ক্ষত চিহ্ন। পুলিশের গুলি খেয়েও প্রাণে মরে নি। আরো পরে আন্দামানে নির্বাসিত হ'য়ে আর ফিরে যায়নি। এখানকার এক স্থানীয় মেয়ের গর্ভেই তার ছেলের জন্ম।

শিবপ্রধানের প্রথম বয়সটা জল কাদায়, দাবানলে পতনোন্মুখ গাছের তলায় কেটেছে।

সে নাকি আদিবাসীদের অনেক মন্ত্র-টন্ত্রও শিখেছে, সুযোগ পেলে বিদ্যুৎচমকে দুশমনের বুকে অদৃশ্য শেল হানতে পারে।

ক্যাপ্টেন অবশ্য ওসব গুনপানার বিশ্বাসী নন। তিনি অনেক শিক্ষিত ও আধুনিক মানুষদের সঙ্গে পরিচিত, যাঁদের বাড়িতে উচ্চাঙ্গের পার্টি বসে এবং অর্গ্যাণ্ডির পর্দা সরিয়ে সুন্দরীরা প্রকাশ্যে আবির্ভূত হন। শিবপ্রধানকে তাঁর পছন্দ শুধু ওর সাহস ও কর্তব্য জ্ঞানের জন্য। লোকটা কথা কয় কম, অল্পে খুশী, পয়সা-কড়ির জন্য বিশেষ হাহাকার নাই, কখনো নিজের মুঠো খুলে দেখেনা—তার প্রাপ্তি নিছক শূন্য! তার চেয়েও বড় কথা, শিব-প্রধান ক্যাপ্টেনেরই মতন সাগরের চরিত্র বোঝে। কখনো গালের

মেচাতা খুঁটতে খুঁটতে সে বলে, 'ক্যাপ্টেন, এখানকার জল ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা; জাল পাতুন, মাছের ঝাঁক ধরা পড়বে…।'

সেদিন মহলের নাবিকরা সত্যি অজস্র মাছ ধরে। আকাশ দেখে প্রধান আবহাওয়ার নির্ভুল পূর্বাভাষ দেয়। জাহাজের কল-কব্জা খুঁটি নাটি বিলকুল তার নখদর্পণে। মুখস্ত তার আন্দামানের প্রতিটি দ্বীপের ভূগোলও। স্বার্থপর লোভী মানুষদের মতন আপন পর ভেদাভেদে কাজে ফাকি দেয় না। ডবকা যুবতী দেখলেই ছোবল তোলে না। যদিও কথা কম বলে, কাঠ-জোয়ান মানুষটার পরিচিত কিন্তু কম নয়। যেমন আজ সে তার ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যাচ্ছে ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডে তার চাষী দোস্তের বাড়িতে।

ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের বনেদী এলাকার উল্টোদিকে যে বন, এখন তারা তাই পাড়ি দিচ্ছে। দামাল সমুদ্রের চিৎকার এখানে ক্ষীণ। খুব কম সময়ের ব্যবধানেই সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে। অন্ধকারে গাছ-গাছালিরা ফিস্ ফাস্ ধূলোপড়া-মন্ত্র উচ্চারণ করে। যত তাড়াতাড়ি এই বন পার হওয়া যায়, ততই মঙ্গল; কারণ, এখানে ভালুকের মতন মেজাজী পশুরা তাদের গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে। নিশিপোকারা সরব, পাখিরা নিষ্ক্রিয়। স্নিগ্ধ রাত্রি তার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। শুক্লপক্ষ নয়,—কালিগোলা অন্ধকার জমাট। কোটি কোটি আলোক বর্ষ-দূরত্ব থেকে নেমে আসা প্রাচীন নক্ষত্রের আবছা আলোই ভরসা।

আর ভরসা শিবপ্রধান, শত অন্ধকারের যার দৃষ্টি বিভ্রম হয় না। দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে পার হচ্ছে শুকনো অথবা, তাজা লতা-পাতা, চাঙর চাঙর গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি,—লক্ষ্য, অদূরের ঐ গ্রামটা।

গ্রামের বসতি কুড়ি ঘরের বেশী নয়। কোন বাড়িতে বুঝি

হাঁড়িয়া খাওয়ার লগ্ন, ছুম দাম মাদল বাজে ও অবিরল হেঁই-হেঁই হুঁই-হুঁই শব্দ।' মানুষ হলেও তারা যে বিজাতীয়, ঐ ধ্বনিসমষ্টিই প্রমাণ।

ক্যাপ্টেনকে অবশ্য ঐ শব্দের উৎস অব্দি যেতে হলো না। প্রথম ঘরখানিই শিবপ্রধানের ইয়ার সুলতান আলীর। কোন কিছু আঁচ করবার আগেই ক্যাপ্টেন ঐ বাড়ির ঝক ঝকে তক্-তকে উঠোনে এসে দাঁড়ান। উঠোনের তিন দিকেই পাকা ফসলের মড়াই, আর এক দিকে বেশ কয়েকটি মুরগির খামার; যদিও মোরগ-মুরগিদের প্রেমালাপ অশ্রুত নয়, চারদিকটা অদ্ভুত নির্জন। সুলতান আলীরা তিন পুরুষ ধরে ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের এই গ্রামে আছে, পূর্বপুরুষরা হিংস্র জাগুয়াদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই চালিয়ে জমি আবাদ করেছে। এখন তার পঁচিশ বিঘে সম্পত্তি, মাটি ও এল-খড়ের চালা এবং একখানা মাছ ধরার ডিঙ্গি।...

বাঁশের দরজায় হাত রেখে শিবপ্রধান ডাকে, 'সুলতান।'

প্রথম ডাকেই সাড়া মেলে না। চারদিকের পরিবেশটা এমন হিম ও স্থির যে মনে হয়, এই ডেরায় হয়তো কোন লোকেরই বাস নাই।

নিজেকে কেমন যেন অচল স্থবির বলে মনে হয় ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের। তাঁর কানের পর্দায় তখনো অতিপরিচিত এঞ্জিনের ডাক ও ফেরী ষ্টীমারের ভোঁ। চাপা স্বরে বলেন, 'হয়তো এখন কেউ নেই। চলো, ফিরে যাই...'

শিবপ্রধান সেই কথা কানে তোলে না, আবার হাঁক দেয়, 'সু-ল-তা-ন।'

এবার কিন্তু স্পষ্টই কার পায়ের খস খসানি শোনা যায়। হ্যারিকেন হাতে দরজা খুলে দাঁড়ায় একটি মেয়ে। একজন পরিপূর্ণ যুবতী, অনন্ত শক্তির আকর নর ও নারী যে বয়সে পরস্পরকে বিপুল শক্তিতে আকর্ষণ করে।

শিবপ্রধান দাঁত বের করে হাসে, ক্যাপ্টেনের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ঘোর,—বাড়ন্ত বয়সের কাঁচা লাবণ্য চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে মেয়েটির সর্বাঙ্গ দিয়ে; বড় কমনীয় তার মুখশ্রী; সন্থ কৌশর উত্তীর্ণার বিস্ময় ও অভিমান আঁকা; সবচেয়ে লক্ষণীয়, ওর রং—এমন লালচে বর্ণ সত্যি সচরাচর দেখা যায় না।

'সুলতান কোথায়?'

'বাপজান অজু করছে। আপনারা ভেতরে এসে বসুন।'

বাইরের ঘরে মাতুর পেতে দু'জনে পাশাপাশি বসে। ক্যাপ্টেন তাঁর বুকের মধ্যে যন্ত্রণাময় এক আবেগ টের পান। এ যাবৎ অনর্গল বয়ে যাওয়া স্রোতে বুঝি এই প্রথম বিপত্তি। গোধুলির কুয়াশায় এসে দাঁড়ালো যে সুন্দরী, কি তার পরিচয়?

চোখের দৃষ্টিতে যেন ছিল হরিণ শিশুর জিজ্ঞাসা। খিচ্ ব্যথার মতন একটা আবেগ কণ্ঠরোধ করে প্রায়। হৃৎপিণ্ডের শব্দ দ্রুততর…।

শিবপ্রধানকে তিনি না বলে পারেন না, 'সুলতান আলীর মেয়ে?'

শিবপ্রধান সামান্য চমকায়, আরো গম্ভীর হয়, চাপা গলায় বলে, 'রক্তের সম্পর্ক নাই।'

'সুলতান তো আদতে শাদীই করে নি।'

নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ ছিঁড়ে বিস্ফোরণ ঘটায় যেন শিবপ্রধান।

বড় বড় চোখে ক্যাপ্টেন জানতে চান, 'তবে?'

বাতাসে শুকনো খড় উড়লে যে শব্দ হয়, শিবপ্রধান সেই আওয়াজে বলতে থাকে, 'একেবারে নিষ্ঠার, রক্তের কোন সম্পর্ক নাই। কোকোর ফরেস্ট বাংলোর কাছে একটা মেয়েমানুষের ডেরায় যাতায়াত ছিল সুলতানের। এক রাতে শঙ্খচূড়ের কামড়ে মেয়েমানুষটা বনেই মরে পড়ে রইলো। আর তার ঐ মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সুলতান।'

মন্ত্র মুগ্ধের মতন শুনছেন গোলাম মহম্মদ। প্রথম দর্শনেই যদি প্রেম সম্ভব হয়, তবে তার ভেতর থেকে উঠে আসছে সেই ভাপ। অপার্থিব সহানুভূতি ও বেদনাবোধে আপ্লুত তিনি।

'মেয়েটা তবে কার?'

'তা কি করে বলবো, স্যর? নষ্ট চরিত্র মেয়েমানুষের কাচ্চা-বাচ্চার বাপকে কি খুঁজে বের করতে পাবে কেউ? চামড়া দেখে তো মনে হয়, কোন সাহেব-টাহেবর রক্ত আছে। ফরেস্ট অফিসার খাস বিলেতের লোক ছিলেন, কীর্তিটা তাঁরও হতে পারে। তবে একটা কথা হলপ করে বলতে পাবি, রাবেয়া সুলতানের মেয়ে নয়।'

'নয় কেন?'

'সুলতানের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

'তবে সে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল কেন?'

'মানুষের মন স্যর, তখন কি ভেবেছিল। পরে হয়তো মায়া পড়ে যায়। তা ছাড়া দেখছেন তো মেয়ের রূপ, শাদীর সময় বহুৎ পয়সা খিঁচতে পারবে সুলতান।'

'তা পারবে।'

—অন্যমনস্ক ক্যাপ্টেন বলেন।

কয়েক পলকের জন্য ক্যাপ্টেনের গোটা অবয়বই গাঢ় ছায়াময় হ'য়ে উঠে। ধুলোট রঙের পর্দা তাঁর দু'চোখে।…ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ ধনী নন। 'মহল' ট্যাগ বিঠল নেভিগেশন কোম্পানীর। এবং ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ অসাধু নন, এ যাবৎ উপরি কামাবার ধান্ধায় ছিলেন না,…কলকাতার কলাবাগান বস্তিতে চাচা ও চাচাতো ভাইদের নিয়মিত টাকা পাঠান। জবরদস্ত পুরুষ হয়েও গোলাম মহম্মদ প্রায় নিঃস্ব। আর সেই মন্ত্রমুগ্ধ মানুষটার কানের কাছে উচ্চারিত হলো :…শাদীর সময় বহুৎ পয়সা খিঁচতে পারবে সুলতান।…

ঝিমুনি লেগেছে ক্যাপ্টেনের। তিনি যেন উদোম আকাশের

নীচে নীল সমুদ্রে সতত ভাসমান সেই বেপরোয়া মানুষটি নন, ভারাক্রান্ত অসহায়তার এক প্রতিভূ। বুকের ভেতর এই প্রথম এক মৌলিক অস্থিরতা। পরিপূর্ণ ভাগ্যবিরোধী মানুষ এই মুহূর্তে ভাগ্যনির্ভর হতে চান।

ছোট্ট হ্যারিকেনটা দুলছে। দুলুনিতে ক্যাপ্টেনের মুখের ভগ্নাংশ একবার আলোকিত, আর একবার অন্ধকার। পায়ে মোজা থাকা সত্ত্বেও বন ক্ষেত ও নাবাল অতিক্রমনের চিহ্ন; ক্যাপ্টেন আপন মনে মোজা ও প্যান্ট থেকে চোর-কাঁটাগুলি খুঁটে খুঁটে তুলতে থাকেন।

এ যাবৎ গোলাম মহম্মদের জীবন যথার্থ সুবিন্যস্ত নয়, অস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমুদ্রে নামেন না; এতকাল তাঁর চিন্তার আছন্নতায় কোন নারী ছিল না; পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা সমুদ্র, বালি, মাটি, বন ও তাদের মিলিত শব্দ, যা প্রায়ই বিচিত্র বাসর হয়ে উঠতো তাঁর কাছে।

চাটের পর্দা তুলে ওঠে, প্রবেশ করে সুলতান আলী।

আলীকে দেখেই ক্যাপ্টেনের চোয়াল শক্ত হয়। মানুষটার চেহারা চেনা চেনা ঠেকছে; নিশ্চয় কোন-না-কোনদিন তাঁর ট্যাগে চেপে দ্বীপান্তরের যাত্রী হয়েছিল। ঘরে ঢুকেই এতক্ষণের শীতার্ত নির্জনতাকে কাটিয়ে সরব হয়ে ওঠে, 'কি প্রধান, কেমন আছো?'

তারপরই ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে বলে, 'আমি তো আপনাকে চিনি ক্যাপ্টেন।'

'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'চেনা চেনা ঠেকছে বটে।'

'আপনার জাহাজে চেপে আমি মাস ছয়েক আগে পোর্টব্লেয়ার গিয়েছিলাম। প্রধান তখন ছুটিতে।'

দু'জনের মুখোমুখি আসন নেয় সুলতান আলী। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, মাংস ও চর্বি ঠাসা মিশকালো শরীর ধব্‌ধবে চাদরে ঢাকা,

মুখময় শাদা-পাকা দাড়ি, দেহ অনুপাতে হাতগুলি যেন ছোট ছোট এবং আঙুলগুলিকে রক্তশূন্য সাদা মনে হয়। সে কিন্তু বেশ খুশী হয়েছে ক্যাপ্টেনকে দেখে, '…তুই সমুদ্র-মানুষ আজ ডাঙায় বসে আছে। আমারই ঘরে! বেশ মজা লাগছে কিন্তু।'

প্রধান বলে, 'মানুষ কি কখনো সমুদ্রের হয়! মানুষ ডাঙারই জীব। নেহাৎ পেটের তাগিদে—'

'তা বটে! রুটির তাগিদে আপনারা জলে, আর আমি বনে।'

আপাতঃভাবে সুলতান আলীকে দিলখোলা মানুষ বলেই মনে হয়। কথা বলে হড়বড় হড়বড় করে, হাসে হা হা করে। থেকে থেকে নিজের জমা-জমা ও আল্লার অকৃপন দয়ার কথা ঘোষণা করে। সখোহিতের দৃষ্টিতে নিজেরই অশেষ কীর্তি এই ঘর-দুয়ার, ধানের মড়াই, নারকেল বন ইত্যাদিকে দেখছে যেন।…একটু বাদেই শরীর-মনের ধাত বদলাবার জন্য নেশার প্রসঙ্গ ওঠে। নেশা ছাড়া মানুষ মানুষের ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। বাসনা অকপট থাকে না, খানিক ভাবে একে অপরের ঢাক গুর গুর কথা শুনে যাবার কি অর্থ থাকতে পারে।…অতএব, তিনজনেই নরক গুলজার। হাঁড়িয়ার বান বয়ে যায় সুলতান আলীর ঘরে। প্রতিটি চুমুকে গোলাম মহম্মদ সেই ঢল ঢলে মুখখানা প্রার্থনা করেন।

প্রধান বলে, 'এই হচ্ছে আরাম। এ আরাম হারাম নয়। আমার জ্বরের অবসাদ কাটছে।'

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার আবার জ্বর কবে হলো?'

প্রধান বলে, 'চাপা জ্বর স্বর, বাইরে থেকে বোঝা যায় না।'

সুলতান আলী তার গেলাস কালো জালাটার গায়ে ঠোকে, নূপুরের মতন বেজে ওঠে। চড়াই উৎরাই অতিক্রমকারী অভিজ্ঞ পাহাড়ীর মতন তার মুখের রেখাগুলি ভাঙ্গতে থাকে, বিচিত্র খস্ খসে গলায় বলে, '…আমি, মাইরি, সারাজীবন স্বার্থের বাইরে কোন কাম করিনি। শাদী করে সংসারী হওয়ার চেয়ে বাইরে একটা খাব সুরৎ

মেয়েমানুষ পোষা অনেক ভালো, ঝকমারি কম।...তার উপর, পেয়ে গেলাম একটা বাহারে লেড়কী, এখন তো লাখো-মে-এক। বাপজান বাপজান ডাকে, আর আমি হিসেব করি, কিতনা রূপেয়া খিচবো ওর শাদীতে!...'

আলীর কথাগুলি হিম ও কঠিন হয়ে বাজে ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের কানে। ঘুলঘুলি প্রায় জানালাটার দিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। বোগেনভেলিয়ার ফুল সমেত একটা লতা ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে।

'আপনি আর একটু নিন ক্যাপ্টেন। হাত গুটিয়ে বসে রইলেন যে!'

—পুরু ঠোঁট চিরে উঁচু দাঁত খিচিয়ে আলী বলে।

'না, এখন আর নয়।'

—সত্যি হাত গুটিয়ে নিলেন গোলাম মহম্মদ। এরই মধ্যে এই হাঁড়িয়া নিয়ে হুল্লোড় তাঁর কাছে অর্থহীন ও এক ঘেঁয়ে, জিনিসটার স্বাদও অসম্ভব টক। জিভের ঝাঁজ ক্রমে ক্রমে থিতিয়ে আসে। তবে যেখানকার যা। ক্যাপ্টেন বিলিতীও খান, আবার পরিবেশের তাগিদে আধময়লা গেলাস অথবা, তালপাতার ঠোঙ্গায় হাঁড়িয়াও টানেন। এখন অবশ্য তাঁর খাওয়ার মাত্রা অনেক কম। নেশায় নয়, মনেরই অস্বস্তিতে এই শীতকালেও টসটসে ঘাম জমেছে কপালে। বাইরে নির্বাধ, অনন্ত আকাশের নীচে বিশাল বনস্থলী ছায়ায় ছায়ায় আরো ঘনীভূত হয়। সমুদ্রের গর্জন তীরের মতন ধেয়ে আসে। হঠাৎ প্রবল উদ্বেগে শেয়ালের ঝাঁক চিৎকার জুড়ে দেয়।

ছটো ঝুপশি গাছের মতন এরা ছ'জন—সুলতান আলী ও শিবপ্রধান। প্রচুর টেনেছে, টানতে টানতে হাঁড়িয়ার হাড়ি ফাঁকা।

হাড়িটাকে ছ'হাতে শূন্যে তুলে সুলতান কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আর নাই প্রধান, আর নাই!'

শিবপ্রধান বুঁদ হয়ে বলে, 'না থাকুক, আমি একটু বাইরে যাবো।'

'কেন প্রধান ?'

'প্রাকৃতিক কারণ।'

'আমিও যাবো '

'চলো।'

সুলতান ও শিবপ্রধান গলা জড়াজড়ি ক'রে এক রকম গড়াতে গড়াতে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

সেই সময় ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ান।

খোজন-খোজন রাস্তা পাব হয়ে আসা পথিকের মতন শপথ-কঠিন ক্লান্তি তাঁর মুখে আঁকা।

অপর দুই সঙ্গীর দিগ্‌দারী দেখে একবার সামান্য বিরক্ত হয়েছিলেন ; কিন্তু পবমুহূর্তে মনে হয়েছে,—এই মৌকা, দ্বিতীয়বার সেই সুন্দরীকে দেখতেই হবে। আশ্চর্য! ঐ সুন্দরীর রূপকে ব্যবসায়ের পশরা বানাতে চায় সুলতান আলী, আর সেই কথাই বাহারে গলায় উচ্চারণ করে খিক্ খিক্ হাসছিল। এতটুকু মায়া নেই ? তকলীফ হয় না ?

তীব্র মাদকতাময় আছন্নতা নিয়ে এই ঘর পেরিয়ে পাশের ঘরে দাঁড়ান ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ। অনুচ্চ আওয়াজ তাঁব গলায়—কোথায় ?' মৌতাত জমানো চোখে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপের চেষ্টা করেন। তবু তাঁর মনে হয়, ঘবময় যেন অসংখ্য অলিগলি কিলবিল করছে, যাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর দিশেহারা অবস্থা। এক ধরনের বিজাতীয় বনজ গন্ধও তাঁর নাকে ঝাপটা মারে।

'কোথায় ?'

এ ঘরে তো সে নাই।

দেখা দাও। আমি ওয়াদা করছি, বাদশাজাদী, তোমার কোন ক্ষতি আমার দ্বারা হবে না।...

ক্রমশ ক্যাপ্টেন তাঁর স্নায়ুকে সজাগ করে দেখেন, এই ঘরটি

অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। ছাদে ঝুলছে মস্ত জাল, লম্বা টিনের পাতে সাজানো উৎকট গন্ধ শুঁটকি মাছ, বড় বড় দুই চটের থলিতে চাল, সুলতান আলীর পশরা স্তূপীকৃত সুপারি, গোটা কয়েক বাক্স-প্যাটরা।

শুধু সে নাই।

তাঁর অন্বিষ্ট রমণী শ্রীময়ী রাবেয়া কোথায়?

হতাশায় নিজের হাঁটুতে দুই থাপ্পড় কষিয়ে ঘুড়ে দাঁড়ান ক্যাপ্টেন।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই খিল খিল হাসি। ধারালো তীক্ষ্ণ হাসি ছুরির ফলকের মতন তেড়ে আসে, কোমলপ্রাণ ক্যাপ্টেন মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যান যেন।

কপাটেরই এক কোণে দাঁড়িয়ে হাসি শানাচ্ছে তাঁর যাবতীয় যন্ত্রণা ও বিস্ময়ের উপশম সেই যুবতী। রক্তবর্ণ মুখে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঐ হাসিতে আত্মপ্রত্যয় আছে এবং আত্মপ্রত্যয় মানুষকে আরো সুন্দর করে।

'কিসের নেশা করেছেন আপনি? হাঁড়িয়া না, হাশীষ?'

ক্যাপ্টেনের চিন্তাকুটিল চোখ বহুক্ষণ অনিশ্চয়তার জাঁতাকলে পিষ্ট, তবু তিনি ভদ্র ও বিনীত হবার চেষ্টা করছেন, 'তোমার বাপজান হাঁড়িয়ার হাড়ি এনে ছিলেন।…আমার অবশ্য তেমন নেশা হয় না।'

রাবেয়ার স্বর এবার সামান্য ঝাঁজালো হয়, 'তবে কি সুস্থ মাথাতেই এ ঘরে ঢুকেছেন?' ক্যাপ্টেন জবাব দেন না। এক বিচিত্র অসহায়তাবোধ তাঁর মগজের কোষে কোষে একটানা হাতুড়ি পিটে চলেছে। তাঁর এই ঘরে অনুপ্রবেশের মানসিকতা এবং এখন যুবতীর মুখোমুখি নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা—একেবারে ছাতিফাট গ্লানি।

রাবেয়া কিছুক্ষণ স্থির কৌতূহলী দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনকে দেখে মানুষটার অঢেল সপ্রতিভতা আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সে মন্ত্রমুগ্ধ নিশ্চল। ঐ এক জোড়া চোখে যথার্থই পাপ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর

চুলের সাপ দুলিয়ে রাবেয়ার তাই তৃতীয় জিজ্ঞাসা, 'এক দর্শনেই বুকের মধ্যে ক্ষত ?'

এ প্রশ্নেরও কোন জবাব নাই।

তাজিমের সঙ্গেই গোলাম মহম্মদ কিছু একটা বলবার চেষ্টা করেন। পারেন না।

'ঐ ক্ষত পরিচর্যার ভার কি আমার ?'

এইবার সমস্ত রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্বেও ক্যাপ্টেন মুখ খোলেন, 'তোমার সঙ্গে কথা ছিল।'

খিল খিল হাসিতে উপচে পড়ে সে, 'থাকবেই তো! তবে আজ যেভাবে নেশা করে মুষড়ে পড়েছেন, তাতে তো কথা বলা চলে না।'

'কবে বলবে ?'

'কাল আসবেন।'

'কখন ?'

'এই সময়। বাপজান যখন থাকবে, তখনই আসবেন। না হলে দরজাই খুলবো না।'

নেশায় বুঁদ শিবপ্রধানের সঙ্গে ফিরে চলেছেন গোলাম মহম্মদ।

প্রধানের যা অবস্থা, তাতে আর তার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া চলে না। তার পা টলছে, মুখে ফেনা। এমনিতে লোকটা কথা কয় কম; কিন্তু এখন প্রলাপের ফাকে ফাকে যা সব বলছে, তাতে রীতিমত ঔদ্ধত্যের ছাপ। '...বায়নাকুলারটা হাতে নিলে আমি গোলাম মহম্মদের চেয়ে বড় ক্যাপ্টেন হতে পারি।...শালা বেইমানি করছে আমার সাথে, বুঝি না ?...'

ক্যাপ্টেন কান দিচ্ছেন না ঐ প্রলাপে, মাঝে মাঝে কেবল কুলঙ্গি থেকে পোঁটলা পেড়ে আনার মতন দূরে সরে যাওয়া প্রধানকে ঘাড় ধরে কাছে টেনে আনেন। তাঁর নিজের পা টলছে না বটে,

কিন্তু ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমের সঙ্গে গুটি কয়েক সুরেলা স্বরকে বহুক্ষণ মগজে ধরে রেখেছেন।···কাল আসতে বলেছে, যখন বাপজান বাড়ি থাকবে, না হলে নাকি রসাতল করে ছাড়বে—কপাটই খুলবেনা। ক্যাপ্টেনের মুখে হাসির প্রলেপ। কাল তিনি যাবেনই—যে বাধাই থাক, তোয়াক্কা করবেন না।

'কিন্তু আবার তখনই এই উৎসাহ ও উত্তেজনার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেন। যতই অভিভূত হই, যতই মনের তাগিদ অনুভব করিনা কেন, কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াবো হাড়িমুখো সুলতান আলীর সামনে?'—পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে করতে বেহেড মাতাল সঙ্গী প্রধানের দিকে তাকান ক্যাপ্টেন; তাঁর দুই চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। প্রধানটাই ভরসা। প্রধানটাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। প্রধানটারই মারফৎ একদিন বক্তব্য রাখতে হবে তো!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই আবার ফাঁপরে পড়লেন গোলাম মহম্মদ।

কাল যে সকাল দশটার মধ্যে 'মহল' ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের জেটি থেকে মুক্ত হবে। কঠিন নির্মমতায় পিষ্টনের ওঠা নামায়, প্রপলারের অহরহ সমুদ্র-স্নানে, মূল ডেকে ও টুইন ডেকে যাত্রী সাধারণের হট্টোগোলে গোলাম মহম্মদ তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবেন।

জীবনের সেই প্রাত্যহিক প্রবহমান স্রোত কি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো? ক্যাপ্টেন কি তাঁর দায়িত্ব ভুলে গেলেন? দুনিয়ার যাবতীয় বন্ধুরতা তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ মাইলের পৃথিবীতে হৃদয় ও দায়িত্বের মধ্যে সহজে সমঝোতা হয় না। গোলাম মহম্মদের দায়িত্ববোধ নিয়ে কেউ কখনো কটাক্ষ করতে পারবে না। এঞ্জিন-রুম থেকে মাস্তুলের গোড়াঅব্দি তাঁর সতর্ক দৃষ্টির ওঠা-নামা; জাহাজীদের রান্না-বান্না থেকে আরম্ভ করে তাদের পোশাক, বাংক, মায় চিরুনি, বুরুশ, আয়না সব কিছুর নির্ভুল হিসাব যেন তাঁর হাতের তালুতে আঁকা।

সেই উৎসাহী সমুদ্র-নায়ক কি ভাবে ভুলে যান, আগামীকাল সকাল দশটার মধ্যে তাঁর ট্যাগ জেটি ছেড়ে যাবে? আশ্চর্য।...

ক্যাপ্টেন স্থির করেন,—জাহাজ তো ছাড়তেই হবে! তবে দু'দিনের জন্য ক্যাপ্টেনের দায়-দায়িত্ব পালন করবেন গোলাম মহম্মদ নয়, এঞ্জিনীয়ার শরিৎ ভূষণ। শরিৎ ভূষণ অভিজ্ঞ, উপযুক্ত; দায়িত্বের চাপে কুঁকড়ে যাবার নয়।

আর একবার স্বস্তির প্রঃশ্বাস ত্যাগের চেষ্টা করেন ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ। কিন্তু ঐ শব্দই যেন তাঁকে ব্যঙ্গ করে। মগজের তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে বেনোজল ঢুকেছে যেন। স্বপ্নের চলচ্চিত্র একটি বিশেষ নারীমুখের জন্য যে গোলাম মহম্মদ এতখানি অনিয়ম করতে পারেন; আগে ধারনা ছিল না। এ ভালোবাসা না, মোহ? যাই হোক্ এর প্রভাব অসাধারণ। পরিণতি যতই অনিশ্চয় অথবা, ভয়াবহ হোক না কেন, মনের বাসনা নিয়ন্ত্রিত হবে না।...

শ্বাপদসঙ্কুল বন পেরিয়ে, মোটামুটি সমতল বালুবেলায় এলোপাথাড়ি পা চালিয়ে আস্ফালনরত প্রধানকে বগলে চেপে 'মহল'-এ প্রবেশ করেন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ বিস্ফোরণের মতন কাঠের পার্টিশানে সজোরে মাথা ঠুকে দেন শিবপ্রধানের। নেশার উত্তেজনার মধ্যেও কঁকিয়ে ওঠে প্রধান, হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাটাতনের ওপর।

ক্যাপ্টেন আর ভ্রুক্ষেপ করেন না। নিজের কেবিনে ঢোকেন।

পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে হু হু বাতাস ঢুকছে; বাতাসে খুব সূক্ষ্ম মিহি জলের বিন্দু, জিভে এসে ঠেকলে যাদের স্বাদ খুব লবনাক্ত। পোর্টহোলের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করেন ক্যাপ্টেন। সমুদ্রে ফসফরাসের আগুন এবং তার ওপর কালো গম্ভীর আকাশ। এলোপাথাড়ি ঢেউ ভাঙ্গে, বিরামহীন গর্জনের অহরহ বজ্রপাত যেন।...

পোর্টহোল থেকে সরে এসে একটা সিগ্রেট ধরালেন গোলাম মহম্মদ, আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়লেন, যদিও বাতাসের দাপটে

ধোঁয়ার রিংগুলি ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যায়। যেন কোন সমস্যার সুরাহা ক'রে ফেলতে চান, এমন এক তৎপরতা দেখিয়ে দেয়াল থেকে ছোট পারদ চটা আরশিটা পেড়ে ফেলেন, মাথার চুলে আঙুল ঢুকিয়ে চুলগুলো সামান্য ঠিক ঠাক করে সেই আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখেন। দেখতে দেখতে বুকের ভেতর একটা অস্বস্তি, চিন্‌চিনে ব্যথা। যৌবনের সিংহদরজা দিয়ে তাঁর অনুপ্রবেশ। বেশ কয়েক বৎসর আগেকার কথা।

শরীরটা নিশ্চল পাথর, মুখের ভাঁজগুলি পর্যন্ত থাক থাক চর্বি-জমাট, চুল তাঁর অনেক পাতলা, যাতে সামান্য সামান্য খয়েরী ছোপ লেগেছে, সন্ধানী চোখ হয়তো দুটি একটি নিখাঁদ সাদা চুলও খুঁজে বের করতে পারে। নিজেরই প্রতিচ্ছবির দিকে চেয়ে ক্যাপ্টেন আপ্তসত্য অনুভব করেন,—সময় বয়ে যায়, সময় বয়ে যায়, সময় বয়ে যায়…।

আয়না হাতে বহুক্ষণ হুশ ছিল না গোলাম মহম্মদের।

সম্বিত্‌ ফিরে পেলেন মাতাল শিবপ্রধানের সোচ্চার প্রলাপে, '…শালা আলী রাবেয়াকে বেঁচতে চায়! রূপেয়া থাকলে—'

প্রলাপ শেষ হয় না, জিভে জড়িয়ে যায়।

নিছকই প্রলাপ। তবু যেন একটা ভেজা ছেঁড়া কাঁথা ছুড়ে মারা হলো ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের মুখের ওপর।

৭

....

বাতের বাড়ে বংস অর্থ সন্ধানে গোবেন ক্যাপ্টেন মহম্মদ]

ফিপ্থ বাউণ্ড কমপ্লিট করবার পর গেলাসে-বোতলে সাময়িক ইস্তফা দিয়েছিলাম আমরা। ইতিমধ্যে গোলাম মহম্মদের গল্পের প্রথম কিস্তি শেষ। শেষ কিস্তিতে বাজি মাৎ হবে, আশা করছি। তাঁর বলার ভঙ্গীটি সুন্দর, আকর্ষক, আড়চোখে শ্রোতাব মুগ্ধতা পরিমাপ করাটুকুও সমভাবে লক্ষণীয়। তিনি যখন গল্প বলছিলেন, তাঁব চেহারায় যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। বেঢপ চেহারার মানুষটাকে মনে হয়েছে, সৌম্য গোছের।

বলতে বলতে মধ্য পথে টেনে নিয়ে গিয়ে মুলতুবী রাখলেন। আমরা কিন্তু অপেক্ষা করছি, চক্রবর্তী ও আমার ভেতর যথার্থ আগ্রহ। বিশেষত: গল্প শোনায় আমার উৎসাহ এখন ষোলো আনাব ওপর আঠারো আনা। অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র্য, ভিয়েতনাম—বিপ্লব ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে সাহিত্যের পুঁজি বানানো আমাব পক্ষে সহজসাধ্য ; কিন্তু ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদকে নিয়ে কলম চর্চা যেন এখন থেকেই আমার রক্তের তাগিদ। ঠিক এই জাতীয় পরিবেশে বিচিত্র স্বাদের সোলকিলিং লাভ-স্টোরি স্বয়ং নায়কের মুখ থেকে শোনার অভিজ্ঞতা আমার নাই।

পরিচ্ছন্ন পূর্নিমা রাত্রে যদিও 'মহল' স্থির নিশ্চল, সমুদ্রের সঙ্গে তার কোন বীতরাগ—সম্পর্ক নাই। চরাচর প্রসন্ন, ঢেউ ভাঙ্গে, গর্জন ওঠে, সমুদ্র-ঘরানা চাঁদের সোহাগে আরো স্ফীত। এই নিশ্চল কেবিনে বসেই মনে হয়, আমরা কোন আদিম যুগের শলাপরামর্শরত দুঃসাহসিক নাবিক কপাটবন্ধ জলযানে চেপে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি।

চক্রবর্তীর যেন অস্থির-পঞ্চক অবস্থা, জুত ক'রে চেয়ারে হেলান দিয়ে দাড়ি চুলকায়, মেজাজী গলায় বলে, 'ফির এক রাউণ্ড।'

এক অদৃশ্য শক্তি এসে ভর করেছে তিন জনেরই ওপর। এখন বুঝি আমরা এক এক জন এক একটা পিঁপে সাবাড় করবার ক্ষমতা রাখি। কিছুই আর তেমন বিসদৃশ লাগেনা, এমনকি পানের টেবিলে ক্যাপ্টেনের হঠাৎ পা তুলে দেওয়া পর্যন্ত; ইতস্তত করবারও কিছু নাই, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা মুছে গেছে; আমি আবছা আবছা দেখছি, গোলাম মহম্মদের রাজ-রাজেশ্বরী সোহাগিনীকে! নিশ্চয় গোলাম মহম্মদের আজকের হাসিনাই সেদিনের রাবেয়া। অর্থাৎ, ও সুলতান আলীর সেই পোষা মেয়ে, মোটা টাকার বিনিময়ে যাকে বেঁচবে বলে পায়তাড়া কষা হচ্ছিলো। আজ ঝুলন্ত সাঁকোর মতন বাংকের ওপর দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে।...

নেশা তার সিঁড়িগুলি টপকে টপকে পার হচ্ছে; এ্যালকহলিক চাপে ভেতরকার বাষ্পীয় অনুভূতি এক একটা উদ্গারে ঠেলে বের হয়ে আসতে চায়, উদ্গার বাসনার সঙ্গে মেপে মেপে হেঁচকিও।

চক্রবর্তীর প্রস্তাবে সায় দিয়ে আমিও বলি, 'আর এক রাউণ্ড হোক।'

ক্যাপ্টেন নিশ্চয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সেই জোব্বাপরা বিশালদেহী লোকটা, যে প্রপেলারের সামনে বসে মাছের ধ্যান করছিল, দরজার সামনে বারেকের জন্য উঁকি দিয়েই একটা বিমূর্ত্ত বৃত্তের মতন হারিয়ে যায়, হয়তো ক্যাপ্টেন—কেবিনের বর্ত্তমান পরিবেশ দেখে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করে।

আমি বর্ণ-বিচিত্র টেবিলের কোন চেপে ধরে ফস্ ক'রে জিজ্ঞে করি, 'এই লোকটাই কি শিবপ্রধান?'

নিরুচ্চার ক্যাপ্টেন বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে তাকান আমি আবার ধুয়ো ধরি, এই 'এই লোকটাই কি শিবপ্রধান?

ক্যাপ্টেন তাঁর মুখে চুমকুড়ি কাটেন, দাঁত চেপে বলেন, 'শিব

প্রধান বেঁচে থাকলে আর যাই হোক, ঐ রকম একটা বুড়ো লোক হতো না।'

ক্যাপ্টেনের স্বর চাপা, কিন্তু বক্তব্য যেন উচ্চরোলে আমাকে আঘাত করে। আমি চমকাই।

'অর্থাৎ শিবপ্রধান বেঁচে নাই?'

'কবে দোজকের পাঁকে গেথে গেছে!'

'কি হয়েছিল?'

'তা হলে তো আবার সেই অঘটনঘটন পটিয়সীর গল্প বলতে হয়।'

'বলুন। দুই ধরনের নেশায় আমাদের জঠর জ্বলছে। এক নম্বর, ওল্ড মঙ্ক, দুই নম্বর আপনার গল্প।'

'এক নম্বরটাই আগে মিটুক, তারপর দুই—'

বলেই টেবিল চাপড়ালেন গোলাম মহম্মদ। পর্দার আড়ালে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল বোথা।

মাঝে মাঝে কিচেনে তার বিজাতীয় গানের কলি শিষের সুরে ভেসে আসছিল। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পেয়ে বোতল হাতে হাজির হয়, গেলাসে গেলাসে একই পরিমান রক্তাভ পানীয় ঢালে নিরুদ্‌-বিগ্ন অচপলতা বজায় রেখে। এতক্ষণে আমি মনে মনে তারিফ করি, বোথা ইজ এন এসেন্‌সিয়াল্‌ পার্সোনালিটি। দাঁতের গোড়ায় জিবের ডগ্‌ ঠেকিয়ে চুক্‌ চুক্‌ শব্দ করে চক্রবর্তী, 'এ যেন মাল নয়, পিওর ব্লাড অফ্‌ দ্যা হার্ট!'

ব্লাড অফ্‌ দ্যা হার্ট—চক্রবর্তীর চটকদার উপমা কিছুক্ষণ কানের কাছে গুঞ্জন করে। মুখের কাছে গেলাস ঈষৎ কাৎ ক'রে সায় দিলেন ক্যাপ্টেন। এই যজ্ঞব্যূহে তিন যোগীপুরুষ হৃদ্‌পিণ্ডের বিশুদ্ধ রক্ত সেবন করছে। তবু এটা শিবহীন যজ্ঞ; কেননা, ক্যাপ্টেনের হাসিনা [আমার ধারণা সে-ই রাবেয়া] অনেকটা ব্যবধানে ঘুমিয়ে আছে। রাত প্রায় কাবার হ'য়ে এলো আর কি! চোখের সামনে কত যে রঙমশালের আলো জ্বলছে নিভছে, কত যে জ্যামিতিক ছক

আঁকা হয়—মুছে যায়, ইয়ত্তা নাই। এমত তুরীয় অবস্থায় ঈষৎ জড়ানো গলায় গোলাম মহম্মদ আবার তাঁর গল্প আরম্ভ করলেন।

* *

*

ট্যাগ 'মহল' চোখের সামনে জেটি ছেড়ে চলে গেল।

যতক্ষণ দেখা যায়, বিমর্ষ চোখে সেদিকেই চেয়ে রইলেন গোলাম মহম্মদ। একটা প্রচণ্ড কম্পনের স্রোত অনুভূত হচ্ছে সারা শরীরে। ক্রমশই তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা,—নির্মেঘ প্রসন্ন আকাশের প্রতিচ্ছবি যে সমুদ্র, তিনি যেন তাকে আর সাদা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। আজ যে তার চোখে বায়নাকুলার নাই! নিঙরানো ধূসর ন্যাকড়ার মতন ঢেউ ভাঙ্গে, ভাঙ্গে একটার পর একটা এবং সেই ঢেউগুলিকে প্রতিবার ডেকে আনে যে বাতাস, তা এলোমেলো ক'রে দেয় এই দুইজনের বাসি চুল—গোলাম মহম্মদ ও শিবপ্রধান।

এই প্রথম ক্যাপ্টেন মহম্মদকে দেখা গেলনা ট্যাগের ডেকে দাঁড়িয়ে চোখে বায়নাকুলার লাগাতে। তাঁর সেই অতিপরিচিত ডাকাবুকো ক্যাপ্তানি আজ আর কেউ লক্ষ্য করবে না 'মহল'-এ। শুধু আজ কেন, আজ-কাল-পরশু—তিন দিন, তিন রাত্রি কাটিয়ে আবার ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের মুখ দেখবে ঐ জলযান। এই তিন দিন, তিন রাত্রির কি করবেন গোলাম মহম্মদ ও শিবপ্রধান? তাজ্জব!

অন্তিম মুহূর্তে 'মহল' যখন ভেঁপু দিয়েছিল, গোলাম মহম্মদ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন; কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণা গলায় আটকানো মাছের কাঁটার মতন খচ্ খচ্ করছিল। আর সেই সময় শরিৎভূষণের দুই চোখের চাকচিক্য কয়েকগুন, আগামী তিন দিন তিন রাত্রি 'মহল'-এর সিংহাসনে বসবে সে। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের কৃপায় ভিস্তিওয়ালার দিল্লীর সিংহাসনে বসবার সুযোগ লাভের মতন। ভিস্তিওয়ালা হুমায়ুনের প্রাণরক্ষা করেছিল, আর গোলাম মহম্মদ

শরিৎভূষণের হাতে নিজের সাম্রাজ্য গুঁজে দিয়ে প্রাণের সন্ধানে ঘুরছেন।

তারা যেন দুই নির্বাসিত মুক্তপুরুষ, বনজ ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডকে চিরে চিরে আবিষ্কার করবেন। সমুদ্রের অজস্র ধ্বনিবৃত্ত মুহুর্মুহু ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ, ঐ সোরগোলের মধ্যেই থেকে থেকে শোনা যায় কোন এক ডাহুকের ডাক। ডাহুকের ডাক তো নয়, যেন বিপন্ন মানুষের কান্না। মাথার ওপর সূর্যের হাজারটা শিখা নাচছে।···সমুদ্র বাস্তবিক নীল আয়না এবং বনের রং যথার্থই সবুজে-হলুদে।

শিবপ্রধানের চোয়ালে সামান্য কাঁপন দেখা যায়। বেচারি ক্যাপ্টেনের এই কাণ্ডর পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। কেন নিজের ট্যাগে ফিরে না গিয়ে স্বেচ্ছায় এই পাণ্ডববর্জিত দেশে পড়ে রইলেন গোলাম মহম্মদ?

ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডে তিন দিন তিন রাত থেকে যাবার মতন কি ঘটলো তাঁর? আর সুলতান আলীর বাড়িতেই বা কি এমন রসের সন্ধান পেলেন, যার জন্য আবার সেখানে ঢুঁ মারতে চাইছেন?

এই দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়েই চমকে ওঠে শিবপ্রধান, যেন একটা নীলচে প্রজাপতি তার দু'চোখে পাখা ঝাপটায়, চলৎ-শক্তিহীন, স্থানু অবস্থায় বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে, এক ধরনের বিভ্রান্তিতে তার হাতের মুঠি শক্ত হয় এবং প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ঘুরে তাকিয়ে ক্যাপ্টেনের মুখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করে সে।···

তারপর তারা দূরের সমুদ্রের দিকে মুখ রেখে একটা ঝাকড়া গাছের নীচে বহুক্ষণ বসে আছে। বরফি কাটা রোদ্দুর পাতার ফাঁক দিয়ে দু'জনেরই ওপর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। আকাশ চক-চকে নীল; এত চক চকে যে চেয়ে থাকা যায় না, চোখ জ্বালা করে।

মাটির উষ্ণতা প্রখর; গোলাম মহম্মদ গরম বোধ করলেন। জামার আধখানা খুলে দিলেন।

এখান থেকে বাতিঘরটা খুবই কাছে, ঐ বাতিঘরেই রাত কাটাবেন ক্যাপ্টেন ও প্রধান। কর্মীরা সকলেই পরিচিত। কি যেন গভীরভাবে ভাবছিলেন ক্যাপ্টেন। অকস্মাৎ যেন স্বপ্ন দেখে চমকে উঠলেন। হু-হু শব্দে একটা বিশাল সামুদ্রিক পাখি পাখা ঝাপটিয়ে বনভূমি পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে উড়তে থাকে।

ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, 'ওটা কি পাখি?'

প্রধান বলে, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

'পাখিটা কি বিরাট!'

'পাখায় দারুন শব্দ!'

'ক্ষিদে পায় নি প্রধান?'

'পেয়েছে।'

'পেয়েছে তো পাউরুটি-জেলি-নারকেলকুচি বের করো।'

উৎসাহে খবরের কাগজ পেতে খাবারের সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে প্রধান। হাত লাগান ক্যাপ্টেনও। পাউরুটির সঙ্গে মোটা নীলচে জেলি মিশিয়ে খাচ্ছেন তাঁরা, বড় বড় দু'একটা নারকেল-পিস্‌ও মুখে পুরছেন।

ক্যাপ্টেন [কপালের ঘাম মুছে, সার্টের আরো একটি বোতাম খুলে অন্যমনস্ক স্বরে]: গতকালের মতন আজও সন্ধ্যায় আমরা সুলতান আলীর ডেরায় যাবো।

প্রধান [ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম বিকৃতি]: যাবো।

ক্যাপ্টেন [নিশ্বাস ক্রমশ সুসম হয়ে আসছে]: সুলতান আলীর সঙ্গে তোমার পরিচয় কত দিনের?

প্রধান [কপালের রেখাগুলি চিন্তা-কুটিল]: অনেক দিনের; তা প্রায় বছর সাতেক হলো। [গলার স্বরে উৎসাহ বৃদ্ধি] পরিচয় হয়েছিল একটা অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়ে। [কপালের কুটিল

রেখাগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে] সেবার আমি জরোয়া আদিবাসীদের পোকা তাড়ানো মন্ত্র শিখে ফেলেছি ; আবার সেবারই হঠাৎ পঙ্গপালের ঝাঁক নামলো আলীর জমিতে [আত্মগর্বে বেশ সুখী সুখী দেখাচ্ছে]। জরোয়ারা আলীকে পছন্দ করে না, আলীর দুর্দিনে কেউ এলোনা পোকা তাড়াতে। খবর পেয়ে আমি গেলাম ; মন্ত্রের জোরে পঙ্গপালদের উড়িয়ে দিলাম আকাশে।

—দুই হাত মেলে শিবপ্রধান যেন সেই পলায়নতৎপর পঙ্গপাল ঝাঁককে দেখায়। চোখ দুটো খুশিতে ধারালো ছুরির মতন চক চক করছে, রোমশ শরীর কদমফুলের মতন রোমাঞ্চিত। কিন্তু ক্যাপ্টেনের মুখ দেখলে অনুমান করা যায়, পতঙ্গ উড়িয়ে দেবার যাদুতে তাঁর আস্থা নাই। তবে কোন প্রতিবাদও নাই।

ক্রমশ স্বপ্নালোকিত বনপথের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন গোলাম মহম্মদ। পড়তি বেলাতেই আলো-আঁধারির খেলা। আন্দামানের বহু দ্বীপ এখনো বাহন আফ্রিকা, প্রায় বে-এক্তিয়ার। ...ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের পেটা ঘড়ি ডেকে ওঠে, সেই একই আওয়াজ আছড়ে পড়ে গোলাম মহম্মদের হৃৎপিণ্ডের ওপর। মনের কথা প্রকাশের জন্য যেন নিজেরই ওপর এলোপাথাড়ি চাবুক চালাচ্ছেন ! —প্রধান, অধস্তন শিবপ্রধানকে গোপন কথা জানাতে হবে ! এ একটা লজ্জাস্কর ব্যাপার ! কি ভাববে প্রধান ? নির্ঘাৎ ভাববে, নগদ-প্রাপ্তির ধান্দা—জোঁকের মতন মেয়েমানুষের রস চুষে খাওয়া, সমুদ্র-মানুষের বুকে কবে আবার পোষা কবুতরের মতন প্রেম এসে বাসা করেছে ? নিছক বহুজন উপগত নারীর অভ্যন্তরে প্রবেশ ছাড়া কি বোঝে তারা ? প্রধান নিশ্চয় ব্যথিত হবে, হয়তো গোপনে রুখেও দাঁড়াবে,—আর যাই হোক, সুলতান আলীর পোষা মেয়ে দেহের ব্যবসা করে না !

কিন্তু গোলাম মহম্মদ অনুভব করেন, খুব চকিতেই প্রেমে তাঁর অধিকার জন্মে গেছে। প্রেম—সুন্দর পবিত্র চিরন্তন। এখানে

কোন মালিন্য নাই। তিনি স্বয়ং ভীরু, কোমল ও প্রণামের মতন আত্মনিবেদনে প্রস্তুত।…সেই এক ঈষৎ রক্তাভ কন্যা, যার জন্ম-ইতিহাস রহস্য ও কলঙ্কে ধোঁয়াটে, যে বড় হয়ে উঠছে এক কুৎসিৎ লোভাতুরের ছায়ায়—আল্লা! তোমার দুনিয়া কী বিচিত্র!…

হঠাৎ ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে: কাল তো খুব নির্জলা আনন্দ করলে।

প্রধান: আপনার বোধহয় হাঁড়িয়ায় রুচি নাই।

ক্যাপ্টেন [ঈষৎ অপ্রতিভ]: না, ঠিক তা নয়, আমার যেন কেমন মাথাটা ভারী ভারী লাগছিল।

মাথাটা তো তাঁর এখনো ভারী ভারী। সত্তা বিদ্ধস্ত। এখনো কি তিনি অনুভব করতে পারছেন না, সেই সহজাত মেয়েলি অন্তদৃষ্টি? শ্বাস-প্রশ্বাসে বুকের ভেতরে বিচিত্র কম্পন।

আচমকাই বুকের জ্বালাটাকে পাকিয়ে ছুড়ে দেন ক্যাপ্টেন: আমি যদি রাবেয়াকে শাদী করতে চাই?

ভূ-ত্বকে যেন কোন আলোড়ন হলো, এমন ভাবে নাড়া খেল শিবপ্রধান, চোয়ালের খিল আলগা হ'য়ে দু'সারি দাঁত বেরিয়ে পড়ে অস্ফুট বোবা গলায় কি যেন বলে ওঠে, শোনা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই সে এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না, আতান্তরে হাবুডুবু খায়। অথৈ সমুদ্র পার হয়ে আসা নাবিক খুবই দিল খোলা প্রস্তাব রাখলেন: আমি যদি রাবেয়াকে শাদী করতে চাই?

অপলকে প্রধানের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন ক্যাপ্টেন। সেই দৃষ্টিতে গভীরতা নাই, আছে উদ্‌ভ্রান্তি, ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, তিনি বন্ধুজনে পুষ্ট না, একেবারে নির্বান্ধব। একটু থেমে আবার বলতে থাকেন, 'আমার ভালো লেগেছে। প্রথম দর্শনেই আমি মুগ্ধ হয়েছি। ভুলতে পারছি না। আমার জীবনে এখন নারীর দরকার। তুমি আলীর সঙ্গে কথা বলো।'

নিশাচরের মতন জ্বলছে শিবপ্রধানের দুই চোখ। আর একবার

তার দুই পাটি দাঁত প্রচণ্ড বিভৎসতায় ঝলসে উঠলো। পাগলা কুকুরের মতন হাঁ ক'রে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে সে। গোলাম মহম্মদের এমন দিলখোলা স্বীকারোক্তি সে কল্পনাও করতে পারে না। খাবসুরৎ জেনানা দেখে যদি শুধু উসখুস করতেন, বলার কিছু ছিল না। কিন্তু বলেন কিনা, রাবেয়াকে যদি আমি শাদী করি? আচমকা বুঝি ঢাকে কাঠি পড়েছে, গুম্ গুম্ শব্দ আসছে চারদিক থেকে।

আর ক্যাপ্টেন বলছেন তো বলছেনই। একবার মুখ খুলতে পেরে আবেগ আর বাঁধ মানে না। নতুবা, ক্যাপ্টেন আবার কবে সারেং-এর এত ঘনিষ্ঠ হয়?···

গোলাম মহম্মদ তাঁর প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়েই রাবেয়াকে যেন খুব কাছে পেয়ে যাচ্ছেন,—রাবেয়ার দেহের সুবাস তাঁর নাকে এসে লাগছে, সুন্দরীর দীর্ঘ চুলের গোছা আছড়ে পড়ছে তাঁর বুকের ওপর; ঈষৎ টল টলে চোখের তারায় অনেকখানি প্রশ্রয়, রক্তাভ গাত্রবর্ণে লজ্জা ও সমর্পণের ইঙ্গিত, নিটোল বক্ষ নাগালের মধ্যে, ঘন সম্বন্ধ গোপনাংশ জানায়, তার গঠন কত নিখুঁত।

শিবপ্রধান দেখে, তাঁর 'বস্'-এর লুব্ধ দৃষ্টি ভয়ানক সুদূরপ্রসারী! কি এক অজ্ঞাতকারণে প্রধানের ভেতরটা রিঁ রিঁ করে ওঠে। জীবনের আড়াইখানা অংশ পার করে সাহেব শালা প্রেমে পড়েছে। তাও তেমন জান-পহ্‌চান লেড়কি নয়, মোটে চোখের দেখা! এক দেখাতেই কিস্তিমাৎ! এতো শুধু মিনিট খানেকের লদগালদগি নয়, একেবারে শাদী করে চিবুকের ডোলে নাক ঘঁষা—পাকাপাকি ব্যাপার! অন্যায় তো কিছু নয়। এবং যেহেতু অন্যায় নয়, এ খোয়াব বাস্তবায়িত হতে পারে। কারণ, লোকটা যে ক্যাপ্টেন এবং প্রধান তার—!

প্রধান কিন্তু এখন চেষ্টা করছে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখার, বয়স্য-

অনোচিত বিনয় প্রকাশ করতে। সেই কারণে ক্যাপ্টেন যখন দেহহীন আবেগে কাঁপছেন, প্রধান অনেক চেষ্টায় মাথা হেঁট করে মাটিতে আঁক কাটে। অতঃপর কিছুক্ষণ একেবারে চুপচাপ। দীর্ঘ ও পুরুষ্টু হাতের আঙুলগুলির দিকে চেয়ে আছে প্রধান। এই সংসারে এই দশটি আঙুল বড় দায়িত্বশীল! ক্যাপ্টেনের হুকুমে এরা কি না করেছে! কিন্তু এই মুহূর্তে দশজনই কেমন যেন বোধহীন, অবশ। হাতের তালুতে অব্দি ঘাম দেখা দেয়!···স্ফটিক রোদ্দুর মরে আসছে। কখনো সামনে, কখনো পিছনে বাতাস ধাক্কা মারে। ঝরা পাতারা এলো মেলো উড়তে থাকে। গাছের পাতারা কাঁপে তির তির করে। চুলের মধ্যে বিলি কেটে কেটে উধাও হয় সেই বাতাস। প্রধানেরই মতন সাড়াহীন উত্তেজনায় স্তব্ধ চরাচর। প্রধানের মতন খুব চেষ্টা করছে, নিজের হিল্লোলিত গর্জন চেপে রাখতে।

শিবপ্রধানের দীর্ঘশ্বাস ক্যাপ্টেনের কানে বাজে। ক্যাপ্টেন তখনো কোন উৎসাহ বাক্য আশা করছেন প্রধানের কাছ থেকে। চিকরিকাটা পাতা বেয়ে যত রোদ গড়ায়, তাঁর কপালের বিমর্ষ ঘাম ততই টোপা টোপা ঝরতে থাকে। শিবপ্রধান নিশ্চয় কিছু একটা বলবে। শুধু কিছু একটা নয়, আনন্দ প্রকাশ করবে, উৎসাহ দেবে। এতকাল পর ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের মনে জাফরানী রং ফুটেছে। শালা, এতদিন লুকিয়ে-চুরিয়ে মেয়েমানুষ চাখতে চাখতে আজ হঠাৎ নিখাঁদ প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করলে! শিবপ্রধান কোন একটা কুৎসিৎ খিস্তিকে মনে মনে জপ করতে চায়। কিন্তু ঠিক পারে না।

কারণ—

গোলাম মহম্মদ ক্যাপ্টেন।

এবং শিবপ্রধান তাঁর সারেং।

ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেনই! সারেং তো তার পা-চাটা কুত্তা। কেবিন

:থেকে যে হুকুম আসবে, তালিম করতেই হবে। এটাই সমুদ্র-আইন। সেখানে সারেং-এর ক্ষমতা কি ক্যাপ্টেনকে অমান্য করে?

শিবপ্রধানের ঠোঁটের দু'পাশে শুকনো ফেনা। সে মুখ খোলে; কিন্তু স্বরে কোন জ্বালা নাই, বলিষ্ঠতা নাই; বরং যেন মোলায়েম গলাতেই সে বলে, 'স্যর, আমার খুব অবাক লাগছে।'

শিবপ্রধান, যে প্রধান ভরসা, হাল্কা ভাবে এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে শুরু করেছে দেখে গোলাম মহম্মদ উৎসাহিত বোধ করেন। প্রধান শুধু অবাক হয়েছে—অবাক হওয়াটা কিছু নয়! সে যদি কোন বিরূপ মন্তব্য করতো, প্রেমিক ক্যাপ্টেনের কাছে সেটা হতো বজ্রাঘাতের সামিল। গত রাত জুড়ে যা ভোগান্তি গেছে তাঁর। দায়িত্বের আর পাঁচটা ক্ষেত্রে নিজেকে বিছিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। অনিদ্রা-জর্জর মাথায় সেই একই বিদ্যুৎ চমক—সুলতান আলীর বাড়িতে ঐ মেয়েটা কী অদ্ভুত! কাল আমি যাবো ওর কাছে, মন খুলে কথা বলবো। কিন্তু পরমুহূর্তে এক মারাত্মক সংশয়,—সুলতান আলীর লোভের থাবাটা যে কত বড় হবে, খোদায় মালুম।

শিবপ্রধানের কথা শুনে গোলাম মহম্মদ তাঁর আবেগের সলতেটাকে উস্কে দিলেন; একটানা যন্ত্রণার মধ্যে মধ্যে যে যতি, তারই আবেশে উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, 'আমি নিজেই কি কম অবাক হচ্ছি, প্রধান? তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে,—জেনানা-ফেনানার দিকে কোনদিনই আমার নেক নজর নাই। আমি চিনি আমার 'মহল', তার ডেক, তার এঞ্জিন, তার প্রপলার, তার চিমনি আর সীমাশূন্য সমুদ্র। এদের বাইরে আমি কাউকে চিনিনা, চিনতে চাইওনি। আর শোন, গত বছর এই সময় ক'লকাতায় গিয়েছিলাম। 'মহল'কে তখন মেরামাতর জন্য টেনে আনা হয়েছে গার্ডেনরিচে।... কলাবাগানে আমার চার চাচার জুতোর কারবার। আমাকে কাছে

ডেকে কানের কাছে মুখ এনে বললে, তোর চাচির বোনটাকে শাদী কর না গোলাম। দেখতে ছুঁরী না হলেও খারাপ না, স্বাস্থ্য দেখেই মজে যাবি; তার উপর বিস্তর রূপেয়া, আর একটা আস্ত মোকাম পাবি খোদ ক'লকাতারই ওপর। বিজনেস্ ফাঁদবি, সাগরে-সাগরে ঘুরে মরতে হবে না। আমার চাচা শাদী করেই কারবারের মালিকানা পেয়েছিল। আমাকেও সেই মৌকা দিতে চাইলে।

আমি রাজি হলুম না।

কি বলেছিলাম, জানো?

বুক চিতিয়ে বলেছিলাম—'চাচা, আমার বিবিতেও দরকার নাই; রূপেয়া-মোকামেও দরকার নাই: যে ক'দিন ছুনিয়ায় আছি, সমুদ্রই আমার বিবিজান হয়ে থাক!'

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর উচ্চস্বর গ্রামে। ঈষৎ হাঁপ ধরেছে তাঁর। স্বপক্ষে এতখানি বলে যাবার পরও কিন্তু নম্র আবেশ ও পরিতৃপ্তি পান না তিনি। যেন ব্রীড়ায় অধোমুখ, কিছুটা বিহ্বল, সন্ত্রস্ত—কি এক অপরাধবোধ খুব সতর্কতায় গ্রাস করছে তাঁকে।

এতক্ষণ যে সাফাই গাইলেন, তার বারো আনা সত্যি। কিন্তু বাকি চার আনি?

সেখানে তো ফাঁকি আছে চাঁদ। প্রথম যৌবন আস্থাহীন, সংক্ষুব্ধ ও বিবিধ দ্বন্দ্বে দিশাহারা।

আঠারো বছর বয়সে ইয়ার দোস্তদের কৃপায় হাড়কাটা গলিতে একবার উঁকি মারার সুযোগ এসেছিল তাঁর। বড় মন, অথচ অর্থহীনতায় ধুঁকতে ধুঁকতে মেয়েমানুষের শরীর সর্বপ্রথম সবিস্ময়ে আবিষ্কার করা।···কি যেন নাম ছিল সেই কাঠ কাঠ চেহারার মেয়েটার?

হুঁ, বোধহয় পারুল। পারুল, চাপা আলো এবং খস্‌খসে সুজনি। এ যাবৎ নারী-দেহের প্রথম ও শেষ অভিজ্ঞতা। মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। ফলতঃ ভোগান্তির একশেষ। হাসপাতালের যৌন বিভাগে গোপনে

চিকিৎসিত হয়েছিলেন গোলাম মহম্মদ,—এ-বেলা চারলাখ ও-বেলা চারলাখ পেনিসিলিন।···ব্যস, সেই রোগমুক্তির পর আর নয়। উগ্র হোক, স্মিতমুখ হোক কোন মেয়েমানুষ তাকে টানে নি। আশ্চর্য মোহশূন্য অথবা, নির্বিকার মানুষ,—বিশাল সমুদ্রের প্রেমে আপ্লুত; দু'দিন-একদিন অন্তর সেই অন্তহীন নীলে-নীলে ঘুরে বেড়ানো, শব্দ মারতে মারতে রক্ত চক্ষু এঞ্জিনের ওঠা-নামা, ঢেউয়ের তালে তালে অসংখ্য যাযাবর পাখিদের নাচ দেখা, কোন কিছুই বর্তমান ও বাস্তব নয় যেন, সবটাই বুঝি স্মৃতির টানে স্বপ্নের টানে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়; 'মহল' বিকট আওয়াজ তোলে, খালাসীরা প্রার্থনা করে, যাত্রীরা কলকলিয়ে ওঠে এবং নৈশব্দে অন্তর্লীন ক্যাপ্টেন চোখে বায়নাকুলার লাগান।···

প্রধান মাথার ওপরের গাছটার দিকে চেয়ে বলে, 'আমি আলীকে বলবো।'

'কি বলবে?'

'আপনি রাবেয়াকে শাদী করতে চান।'

'বেশ, বলবে; সরাসরি বলবে।'

'কিন্তু স্যর—'

'কিন্তু কি?'

'আলীর টাকার খাঁই বড় বেশি।'

ক্যাপ্টেনের মুখের রং তাম্রাভ বেগনী হয়, চোয়াল কঠিন হয়, ভ্রূকুঁচকে বলেন, 'শিবপ্রধান আমি একজন ক্যাপ্টেন। আমি সৎ মানুষ। আমার যে বিবি হবে, তার ইজ্জত থাকবে, সুখ থাকবে।'

—আবার বুঝি গোলাম মহম্মদের অফুরাণ আত্মপক্ষ-সমর্থন সুরু হয়। ঠোঁট তো নয়, যেন ইস্পাতের ফলক—ঝিলিক দিয়ে দিয়ে ওঠে।

প্রধানের হাবভাবে বিরক্তি সুস্পষ্ট। কিছু না বলে উঠে দাঁড়ায়।

সবুজে সবুজ উৎফুল্ল বনকুল গাছটাকে তাক করে একটুকরো পাথর ধাঁ করে ছুঁড়ে মারে। লক্ষ্য অব্যর্থ। ঝুর ঝুর কতগুলি বনকুল ঝরে পড়ে। আচমকা ডেকে ওঠে কাক। ঈষৎ ঝটপটানি শোনা যায় কোন পাখির। তারপর আবার সব নিঃসাড়।

প্রধান ফিরে আসে; এই মুহূর্তে অবলম্বনহীন মনে হয় যে মানুষটাকে, তাঁর দিকে ঝুঁকে বলে, 'রাবেয়ার সুখ আর ইজ্জত নিয়ে মাথা ঘামাবার পাত্র নয় আলী। টাকা তার চাই।'

ক্যাপ্টেনের গলায় ঝাঁজ, 'তোমাকে কি আলী তাই বলেছে?'

প্রধান বলে, 'বলেছিল অনেকদিন আগে। রাবেয়া মৎস্যকন্যার মতন সমুদ্রে লাফালাফি করছিল। আলী তখন আমাকে বলেছিল, রাবেয়ার বাজার দর সে একবার বাজিয়ে দেখবে।'

ক্যাপ্টেন মুখ বিকৃতি করেন, 'ছ্যা-ছ্যা, কি জঘন্য রুচি! নাই বা হলো নিজের রক্তের, তাই বলে—'

কথা শেষ করেন না ক্যাপ্টেন। মুখে তাঁর যেন প্রদোষকালীন আঁধার ও ছায়ার খেলা।

প্রধানের চোখে কৌতুক নাচে, 'খুব নোংরা লোক। কিন্তু উপায় কি?'

ক্যাপ্টেন মাটিতে কিল মেরে বলেন, 'ঠিক হ্যায়, ম্যায় রূপেয়া দেউঙ্গা। লেকিন, ম্যায় সওদা নেহি করুঙ্গা, শাদী করুঙ্গা!'

উত্তেজনা চরমে উঠলে অথবা, খুব ঢলে-ঢালা মেজাজে নেশা করলে গোলাম মহম্মদ এরকম ছেঁড়া ছেঁড়া হিন্দী উর্দু বলে থাকেন।

ক্যাপ্টেনের এই কথাগুলি যেন শপথের মতন কঠিন হয়ে বাজে প্রধানের কানে। বর্তমান পরিবেশে এই প্রথম গোলাম মহম্মদের ব্যক্তিত্বের কাছে ঈষৎ ম্রিয়মান হয়ে পড়ে সে। তার ঠোঁট নড়ে শব্দহীনতায়, আত্মগত যন্ত্রণায় দুই চোখ জ্বলতে থাকে। তার আবছা উপলব্ধির সীমান্তে একখানা ছবি—বড় আশ্চর্য সুন্দরী জলকন্যা

জলকেলি করছে, চতুর্দিক সুর্যহীন হিম হিম, সমস্ত মনজুড়ে অব্যক্ত বাসনা, দুর্দ্দান্ত ডাকাতি রক্ত অস্ফুট বাষ্পাবেগ চেপে রাখে।

ক্যাপ্টেন এখনো প্রধানের বদ্ধ রক্তের গন্ধ পাচ্ছেন না, দেখছেন না ওর মুখের অস্ফুট জটিল নকশাগুলি। প্রধানের শিরা উপশিরা স্ফীত হয়। আত্মমগ্ন হ'য়ে ভাবেন, রূপেয়ার দরকার, রূপেয়ার দরকার! প্রধান কোন ভয়াবহ মন্ত্রকে স্মরণ করবার চেষ্টা করে।

ক্যাপ্টেন স্বপ্ন দেখেন, রাবেয়াকে বিবি করে তিনি তাকে যথাযথ সামাজিক মর্যাদা দেবেন।...

চাণক্যের মতে, উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে যে সঙ্গ দেয় সে বান্ধব। ক্যাপ্টেন তাঁর সারেংকে তেমনি বান্ধব ঠাওরে রাজদ্বারে নয়, প্রায় ম্যাপ মেপে মেপে আলীর ডেরার দিকে রওনা দিলেন। নিজের অকপট স্বীকারোক্তি যতখানি দেবার দিয়েছেন, কিন্তু স্যাঙাতের মনের ভাবখানা যে কি, ভাববার ফুরসৎ অব্দি তাঁর নাই।

তখন বেলা পড়েছে, সন্ধ্যা হয় হয় এবং ইস্টার্ন-আইল্যাণ্ডে সন্ধ্যা মানেই অমাবস্যার সামিল—দু'দে লোকেরও জঙ্গলে ঢাকা শুকনো জলার মধ্যে খাবি খাবার সম্ভাবনা। ধূলিবর্ষণের মতন মরা পাতার টুকরো-টাকরা নিয়ে ঝির ঝিরে বাতাসের দাপট। পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করবার মতন সবটুকু আলোকে চেটেপুটে খায় যেন ঐ সব গাছ-গাছালিই। গুল্মে ছাওয়া বালিয়াড়ি অনেক পিছনে। সমুদ্রের ডাক এখন হুংকার নয়, গোঙানি। সামনেই রাক্ষুসে রাত হাঁ করে আছে, ডালপালার খসখস, মর্মান্তিক নিঃসঙ্গতা।...

ডেরায় ঢুকবার মুখেই আলীর সঙ্গে মুলাকাৎ।

সে যেন হুঁকো হাতে কান পেতে ছিল। মাঝে মাঝে কাকের ভাঙা ভাঙা ডাকের মতন কাদের শাসাচ্ছে, 'যে শালা আমার বাগানের বেড়া টপকাবে, তার ঠ্যাং কেটে রাখবো।...শূয়োর কা—'

খুব একটা অশ্লীল গালি-গালাজ নয়। কিন্তু বলার ভঙ্গীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্রমে.শালীনতা বিশেষ ছিল না।

'আলী! একটু থামো। ঘুরে তাকাও।'

—প্রধান অনুচ্চস্বরেই বলে।

আলী ঘুরে তাকায়। গোলাম মহম্মদ আর শিবপ্রধানকে দেখে সত্যি থ। তার ছুলিভরা মুখের চামড়া টান টান হয়। সে ঠিক এই সময়ে এদের উপস্থিতি আশা করতে পারে নি। ঘড়ির কাঁটা ধরে আজ সকাল দশটায় 'মহল'-এর ইস্টার্ন-আইল্যাণ্ডের জেটি ছেড়ে চলে যাবার কথা। অথচ, এই সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন আর সারেং দুই প্রেতায়িত চরিত্রের মতন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রধান লক্ষ্য করে, সুলতান আলীর পরনে চেকনাই লুঙ্গি, দাড়িতে মেহেদি, চুলে টেরি, হাতে চক চকে হুঁকো,—সবকিছু পরিপাটি। বাবু বোধহয় আর কিছুক্ষণবাদেই কোথাও অভিসারে যাবেন!

সুলতান আলী (জলচৌকির পাশে হুঁকো নামিয়ে রাখতে রাখতে): আরে প্রধান, তোমরা! কি ব্যাপার?

প্রধান (হাসবার চেষ্টা করে): ভাগ্যের চক্করে আসতে হলো। ক্যাপ্টেন সাহেবের এ দ্বীপটা খুব ভালোলেগে গেল। আরো দুটো দিন থাকতে চাইলেন।

আলী (হো-হো হাসি): দ্বীপ ভালো লাগলে ক্ষতি নাই; কিন্তু দ্বীপের মানুষগুলিকে যেন ভালোবেসে ফেলবেন না।

গোলাম মহম্মদ: কারণ?

আলী: কারণ, ওরা কখনো বকরি, কখনো কশাই। স্বার্থের জন্য এরা আপনার পা চাটবে; আর স্বার্থ সিদ্ধি না হলে চাকু চালাবে।

গোলাম মহম্মদ: এটা বুঝি আপনার অভিজ্ঞতা?

আলী: আলবাৎ। আগে খুব মার খেয়েছি, খুব ঠকেছি।··· এখন আমি ইমানদার লেঠেল। বেয়াদপির জবাব দিতে জানি।

—হাত তুলে এমন ভঙ্গী করে সুলতান আলী, যেন সে দোহার গাইছে। কাল এই লোকটাই হাঁড়িয়া টেনে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। বিশ্বাস করা কঠিন। কোন মানুষকেই কি আর এক-দর্শনে চেনা যায়? মানুষের ভেতরকার ডিভালাপ প্রিন্টিং পেতে সময় লাগে বৈ কি!

তিনজনই বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে গত সন্ধ্যার মজলিশী ঘরে মাদুর পেতে বসে।

আজ অবশ্য হাঁড়িয়ার জালা আসবাব কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

আলী ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার জাহাজ এখনো জেটিতে?'

'না, ঠিক সময়েই জাহাজ ছেড়েছে।'

'কিন্তু আপনি—'

'ছুটি নিলুম। অন্য একজন দু'দিনের জন্য ক্যাপ্তেনি করুক।'

আবার হো-হো করে হাসে আলী,—'ক্যাপ্তানি! বেশ বলেছেন। বেশ।'

প্রধান মাদুরে অদৃশ্য রেখার আঁক কাঁটতে থাকে। বিশেষ কোন পরিকল্পনা রচনার পূর্বমুহূর্ত বোধহয়। বাইরে নিশিপোকাদের নৈশ আলাপ শুরু হলো। নাক্ষত্রিক আকাশ জ্বলছে।

আলী গলা খাঁকারির পর হাঁক দেয়, 'রাবেয়া।'

সেই ডাকে ক্যাপ্টেনের বুকের ভেতর টাইফুন। একবার মাথা তোলেন, আবার হেঁট করেন। তৃতীয়বার যখন মাথা তুললেন, তখন তাঁর চোখের সামনে সেই মূর্তি—রাবেয়া। আজ পরেছে লাল রংয়ের ময়লা শাড়ি, চুল খোলা, বুকের বাঁধনও ঈষৎ আলগা; তবু দর্শনে চটকদার, চমকে উঠবার মতন রূপ। ক্যাপ্টেনের দিকে চোখাচোখি হতেই সপ্রতিভ হয়, 'সত্যিই এসে গেলেন!'

ক্যাপ্টেন মুগ্ধস্বরে বলেন, 'এলাম!'

আলী অবাক হয়, 'কেয়া বাৎ! আপনার সঙ্গে রাবেয়ার মুলাকাৎ হলো কবে?'

জবাবটা দেয় কিন্তু প্রধান, 'কাল সন্ধ্যায়। আমরা তো দু'জন মিলে তখন খুব কায়দা-কেতায় হাঁড়িয়া টানছি। স্যরের তো ও-সব দিশিতে রুচি নাই। উনি গিয়ে আলাপ জমালেন রাবেয়ার সঙ্গে।'

প্রধানের স্বরে এমন কিছু একটা আছে, যা চাবুকের মতন সপাং সপাং বাজে।

মিশনারি পালিত হটেণ্টটদের মতন মুখের চেহারা দাঁড়ায় আলীর। রাবেয়ার মুখে সে বৃথাই রহস্য খোঁজে। অনেকটা যেন বিমর্ষ গলায় বলে, 'চা কর, রাবেয়া।'

রাবেয়া আর একবার ক্যাপ্টেনের দিকে কটাক্ষ ক'রে ফিরে যায়। সেই অপস্রিয়মান ছায়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকেন গোলাম মহম্মদ।

প্রধানের মুখ থেকে হাসির রেখাগুলি মুছে যায়নি। বরং সেগুলি আরো শানিত ও হিংস্র হচ্ছে। ঘাড় বেঁকিয়ে শেষটায় আলীকে চাপা স্বরে বলে, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।'

আলীর বাঁ চোখ ছোট হয়, 'বলো।'

প্রধানের নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়ে, 'এখানে নয়, বাইরে।'

'বাইরে কেন?'

'একটু গোপন কথা।'

কয়েক মিনিট ধরে নিঃসাড়ে সুলতান কি যেন ভেবে নেয়। তারপর সে ও শিবপ্রধান উঠে দাঁড়ায়। দুই একাত্মজনের মতন একের পিছনে অপরে গড়াতে গড়াতে ঘরের বাইরে চলে যায়।

একা ঘরে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা এখন গোলাম মহম্মদের। বাতাসে বিচালি আর টাটকা দুধের গন্ধ। ঝিঁঝির ডাক, ঘুমন্ত মুরগীর হঠাৎ চাঞ্চল্য। মহম্মদের বুকে শত শত টান টান তারের

ঝংকার। 'প্রধানটা ঠিক মতন বার্গেনিং করতে পারলে হয়। মনে তো হয় পারবে। শত হলেও আমি তো একজন ক্যাপ্টেন! এই জলা-জঙ্গল থেকে খাঁটি মুক্তা তুলে নিয়ে যাবো।'...

এক সময় গোলাম মহম্মদের বাসনা জাগে, আলীটার দাড়ি খামচে ধরে ধেই ধেই করে নাচবেন,—রাবেয়ার মতন একটা মেয়েকে মৃত্যু অথবা, অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা তো করেছে! শাদী হয়ে যাক। তারপর তিনি রাবেয়াকে আধুনিকা করবেন, বিলিতি পোশাক পরাবেন এবং সাহেবী নাচের সময় রাবেয়া স্কার্ট তুলবে বড় জোর হাঁটু অব্দি

ভাবতে ভাবতে পুলকিত সাহেব-জাদা গোলাম মহম্মদ চনমনে গলাতে ডেকেই বসলেন, 'রাবেয়া।'

অবাক কাণ্ড। ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন আর একবার বাতাসে ভেসে এলো রাবেয়া। চকিতে হাঁটু ভেঙ্গে বসে গোলাম মহম্মদের কাছে, আশ্চর্য চোখ দুটো মেলে বলে, 'বলুন'।

'কি করছিলে?'

'আকাশের দিকে চেয়ে ছিলাম।'

'কেন?'

'উল্কা পড়ে কিনা, দেখছিলাম।'

'তুমি বুঝি প্রায়ই উল্কাপাত দেখো?'

'হুঁ, প্রায়ই। সাতদিন আগে এখানে একটা তারা পড়েছিল, আমাদের বাড়ি পেরিয়ে বড় টিলাটার ওপর।'

'কি আলো! গোটা আকাশ ঝলসে উঠলো। আর গোঁ-গোঁ আওয়াজ!'

'আল্লা! তারপর?'

'আমি ভাবলাম, ওটা কুড়িয়ে আনবো। বা-জান নিষেধ করলে।'

রাবেয়ার চোখ তারার মতনই মিট মিট করে। মহম্মদের

মুগ্ধতা আরো গভীর হয়। ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে চেয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে রাবেয়া, 'আমি জানি আপনারা কেন এসেছেন।'

'কেন বলতো?'

'বা-জানের কাছে প্রস্তাব দেবেন।'

'কি প্রস্তাব?'

'সেটা আমি বলবো না।'

ক্যাপ্টেন বিস্ময়ে রীতিমত হকচকিয়ে যান, 'প্রস্তাবের কথা তুমি কি করে জানলে?'

রাবেয়ার শান্ত, সুরেলা গলা, 'জানলাম না, টের পেলাম। জানালা দিয়ে দেখেছি, প্রধান বা-জানকে বোঝাচ্ছে। ব্যাপারটা আপনার আমার।'

কী স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। লজ্জাহীনতা নয়, সরলতা।

গোলাম মহম্মদ ফিস্ ফিসিয়ে ওঠেন, 'কি বলছিল ওরা?'

'আপনার নাম, আমার নাম। আর টাকা-পয়সার হিসেব হচ্ছিল।'

টাকা-পয়সা—শব্দ দুটো জ্বালাধরানো। মেজাজে ঈষৎ খিচ্ ধরে মহম্মদের। গরু-ভেড়া-পাঁঠার মতন মেয়েটাকে বেচতে চায় আলী। এত সুফলা জমি চষেও মনটা ওর উর্বরা হয় নি।...

হঠাৎ সমগ্র বনভূমি জুড়ে বাতাস ঝাপটা মারে। সমর্মরে উড়ে যায় ঝরা পাতা।

বড় বড় চোখ মেলে রাবেয়া তার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার গল্প বলে।

'এই যে দেখছেন, বাতাস বইছে, এটা কিন্তু সাধারণ বাতাস নয়। নিশ্চয় বনের কোথাও আগুন লেগেছে। একটু পরেই দেখবেন, বাতাস কেমন গরম হ'য়ে ওঠে।'

'দাবানল।'

'ঠিক দাবানল। আপনি কোনদিন দাবানল দেখেছেন?'

'না।'

'আমি দেখেছি, অনেকবার দেখেছি!'

'আমি তো বনে বাস করি না।'

'অহংকার হচ্ছে, না? জানি, বনে থাকেন না, সমুদ্রে থাকেন।'

'তোমাকেও নিয়ে যাবো বন থেকে ঐ সমুদ্রে।'

'খুব হয়েছে। জলে জলে তো ঘোরেন; বলুন তো, মাছ কোথায় ঘুমায়?'

'কি মুশকিল! জলে জলে ঘুরি মানে তো জলে ডুব দিয়ে বসে থাকি না।'

'পারলেন না তো? মাছ সন্ধ্যার পর কিনারে চলে আসে, শ্যাওলায় বা, বালিতে ও মাটিতে গা বিছিয়ে ঘুমায়।'

'তাই নাকি?'

'হাঁ, তাই। আর জানেন তো, বনে এক রকম মাকড়সা আছে —ইয়া বড়, জাল পেতে ছোট ছোট পাখিদের আটকে ফেলে।'

'বটে। তুমি এত জানলে কি করে?'

'জানি। আমি ঘুরে ঘুরে সব দেখি। বা-জান যখন বাড়ি থাকে না, আমি ঘুরে ঘুরে সব দেখি। জানেন তো, জরোয়ারা এমন মন্ত্র জানে যে, মন্ত্রপুত আয়নায় দুশমনের রক্ত চুষে খায়। আর দুশমন যদি ঐ আয়নায় একবার নিজের মুখ দেখে তো কেল্লা ফতে—সঙ্গে সঙ্গে মুখে রক্ত উঠে শেষ।'

'ইস! তুমি জানো, ঐ মন্ত্র?'

'ইচ্ছা ছিল। বা-জানের ভয়ে শিখতে পারিনি। বা-জানের সঙ্গে জরোয়াদের দুশমনী আছে।'

গত বছর লোক লাগিয়ে বা-জান ওদের এলাকায় আগুন ধরিয়েছিল। অনেকে পুড়ে মরেছিল।

'খুব নিষ্ঠুর তো।'

রাবেয়া এতক্ষনে চুপ করে।

হঠাৎ গোলাম মহম্মদ বলে ওঠেন, 'আলী তো তোমার বাপজান নয়, রাবেয়া।'

রাবেয়ার স্ফটিক-দীপ্ত মুখে বিমর্ষ মেঘের ছায়াপাত ঘটে, 'ছি! ও কথা বলতে নেই।'

ক্যাপ্টেন সামান্য অপ্রতিভ গলায় বলেন, 'আমি তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য বলিনি। প্রধানের কাছেই শোনা।'

'আরো শুনেছি, তোমার বা-জান নাকি তোমাকে দিয়ে বড় দাও মারার মতলবে আছে। শাদীর সময় টাকা খিঁচবে।'

রাবেয়া অধোমুখী, ভাঙ্গা গলায় বলে, 'আপনাদের ব্যাপার আমাকে বলবেন না।'

ক্যাপ্টেন প্রসঙ্গ বদলান, 'তুমি খুবই সুন্দরী। যে একবার দেখবে, সে-ই মজবে।'

রাবেয়া আরো লাল, 'দেখলেই মজবে, এ কথা মানতে রাজি নই। আপনার দোস্ত প্রধান তো—' রাবেয়ার বক্তব্য শেষ হবার আগেই উৎকট হাসিতে ফেটে পড়েন মহম্মদ, 'প্রধান! খুঁজে পেতে শেষ অব্দি বের করলে প্রধানকে!'

'কেন, প্রধান কি?'

'মরুভূমি, মরুভূমি! সারাটা জীবন খোদার খেসারত গুনছে। ভাব-ভালোবাসার ও কি বোঝে?'

ক্যাপ্টেন যেন খুব উল্লসিত। উল্লাসের মাথায় রাবেয়াকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

সিগ্রেট ধরাতে গিয়ে মালুম হলো, ঘামে গোটা প্যাকেটটাই ভিজে চুপসে গেছে। সখেদে বললেন, 'ইস, গোটা প্যাকেটটাই নষ্ট। কথায় বলে ভিজা তামাক আর রুগ্ন ঘোড়া—কোন কাজেই লাগে না।'

রাবেয়া চাপা স্বরে বলে, 'বা-জান আর প্রধান উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।'

'ক্যাপ্টেন যেন শুনতে পান নি, এমন দরাজ গলায় বললেন, 'দুনিয়াটা অনেক বড়। তোমার তো কিছুই দেখা হয় নি '

রাবেয়া মাথা নাড়ে।

ক্যাপ্টেন হাঁটুর ওপর থাবা রেখে আরো খানিকটা কুঁজো হন, রাবেয়ার চোখে অস্বস্তির ছায়াপাত সত্বেও দিব্যি বলে চলেন, 'তোমাকে আমি অনেক কিছুই দেখাবো। আমার জাহাজ তো আজ এ বন্দরে, কাল ও বন্দরে। ক'লকাতায় নিয়ে যাবো। ক'লকাতার নাম শুনেছো? দুনিয়ার অতবড় শহর খুব কম আছে। বড় বড় হোটেলে মেম-নাচ হয়। আর ওখানকার বাবুর্চিরা এক একজন খাঁটি আর্টিস্ট।...আমার জাহাজের নাম 'মহল।' শাদীর পর আমার কেবিনটাকে নতুন ক'রে সাজাবো। আ্কওয়াটিন্টের উড্‌কাটে ঘরটাকে তখন এমন সাজাবো না!'

—কথার পিঠে কথা সাজিয়ে আপন রঙে মসগুল গোলাম মহম্মদ। এই অতি আলাপী প্রেমিকের দিকে চেয়ে মুখে আঁচল চেপে নিঃশব্দে হাসে রাবেয়া। তারপব হরিণীর গতিতে ছুটে পালায়।

বাইরে উঠোনে, তখন শিবপ্রধান ও সুলতান আলী পাশাপাশি, কখনো স্থির, কখনো পায়চারিরত, কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে।

বেড়া থেকে একটা শুকনো বাঁকাট্যারা কাঠি ভেঙ্গে আলী মাটির ওপর তাই দিয়ে কতগুলি অর্থহীন আঁকিবুকি কাটতে থাকে, তারপর বলে, 'ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ অত্যন্ত মান্যজন। রাবেয়াকে শাদী করতে চান; আমি কেন বেওকুফের মতন বাধা দিতে যাবো। প্রধানের কাঁধদুটো কেঁপে ওঠে, এমন ভাবে তাকায় যেন তার দুই চোখ ছাই-মাখা; ধীরে ধীরে সেই দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে এক ধরণের আর্তি, 'কিন্তু বয়স? গোলাম মহম্মদ রাবেয়ার প্রায় বাপের বয়সী।

শাদীর রাতেই রাবেয়ার চোখের জলে মহম্মদের কাঁধটা বুকটা ভিজে যাবে!

আলী হাসে, 'না, অতটা নয়। কেঁদে কেঁদে ঠোঁট ফোলাবার কোন কারণই ঘটবে না। তা ছাড়া কৃতি পুরুষের আবার বয়স কি গো? আমার মতন তো জমি চষেন না, নারকেলও চালান দেন না।'

'জমি চষা আর নারকেল চালান দেওয়া কি খুব খারাপ কাজ?'

'খুব খারাপ।'

'ক্যাপ্তেনী করার চেয়েও খারাপ?'

'হাজার-হাজার গুন খারাপ।'

প্রধানের চোয়াল কঠিন হয়, 'তা হলে এই শাদীতে তোমার মত আছে?'

দূরের বনের মাথায় জোনাকী-ঝাঁকের দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থাকে আলী। এই চকিত স্তব্ধতার মধ্যে কি এক অলৌকিক ভাব তাকে স্পর্শ করে যায়। বিষন্ন মাথাটা ঝুঁকিয়ে সে বলে, 'অমত কেন হবে, প্রধান? তবে—'

বেসামাল প্রধান লুফে নেয় কথাটা, থুতনি কাঁপিয়ে জানতে চায়, 'তবে কি?—'

খুব আস্তে আস্তে আলী বলে, 'তুমি তো জানো, টাকা-পয়সা জমি-জমার ওপর আমার অদ্ভুত আসক্তি। বলতে পারো, একটা ভীষণ লোভ। হাজার ইচ্ছা শক্তিতেও এ লোভ দমিয়ে রাখতে পারি না। যদিও জানি, আমার কবরে চেরাগ দেবারও কেউ থাকবে না, তবু…। আমার কিছু টাকা চাই। নারকেলের কারবারটা ঠিক মতন কব্জা করতে হবে!'

প্রধানের সারা মুখময় বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তার নেভা নেভা চোখে নতুন আলো।

সতৃষ্ণ গলায় বলে, 'নিশ্চয়।…সবচেয়ে বড়া রূপেয়া! ··কত টাকা?'

আলীর স্বরে কুণ্ঠা, লজ্জা, 'একটু বেশী—হাজার খানেক।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রধানের মুখ বিকৃত হয়, স্বরে অস্থির হিংস্রতা জাগে, 'রামো ঃ।'

'এ যে ভিক্ষার অধম। মাত্র হাজার টাকা! রাবেয়ার মতন সুন্দরী মেয়েকে একটা বুড়োর সঙ্গে জুতে দিচ্ছো মাত্র হাজারটা টাকার বদলে! তোমার নজর খুব ছোট আলী!'

আলী চমকে ওঠে; আহত স্বরে বলে, 'নজর আমার ছোট নয়, প্রধান। আজকাল আমার ভেতরে আর একটা লোক মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। জানো, রাবেয়ার মরা মার ঠোঁটে আমি চুমু খেয়ে ছিলাম—একেবারে বরফ! সেই ভয়ঙ্কর বদলোক আমি, প্রায় রাতেই ঘুমোতে পারি না। ঘুম আসে না। শূন্য আঁধারে চোখ মেলে যেন রাবেয়ার মাকে দেখতে পাই। একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাই, ঠিক যেমন এই তোমায় দেখছি। সে যেন আমাকে বলছে, 'আলী, আমার মেয়ে যেন আমার মতন পাঁকে না পড়ে ...'

সুলতান আলীর এমন আন্তরিকতা যে কিছুক্ষণের জন্য শিব-প্রধান কোন মন্তব্য করতে পারে না। সেই তেজী রাগী লোভী মরদ আলী কবে যেন অনেক বদলে গেছে।

ওর না-কাঁদা চোখের জল হৃৎপিণ্ডে জমে আছে।

কিন্তু প্রধান তো গলে যেতে পারে না। তারও বুকের মধ্যে একটা বিশ্রী বাসনা থাকে স্বেচ্ছায় ছিঁড়ে ফেলতে মন চায় না। তাই দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'সেন্টিমেন্ট!'

'...আলী, আমি তোমার দোস্ত। তোমার ভালোটাই চাই। এই হচ্ছে মওকা,—হাজার পাঁচেক হাতিয়ে নাও।'

যেন উদ্দাম ঝড়ে নিক্ষিপ্ত বাঁশপাতার মতন আঁতকে ওঠে আলী, খুবই নিঃসঙ্গ গলায় উচ্চারণ করে, 'পাঁচ হা-জা-র!'

অনমনীয় ইচ্ছাশক্তিতে আত্মসংবরণ করে শিবপ্রধান, আরো কঠিন গলায় বলে, 'পাঁচ হাজার এমন কিছু নয়। গোলাম মহম্মদ

ও টাকা দেবে। মেয়েমানুষ দেখলেই যার লালা গড়ায়, কাছা খুলে যায়, রাবেয়ার দাম সে পাঁচ হাজার টাকা দেবে না?'

'ইয়ার্কি নাকি?'

নিজের সবটুকু সামর্থ্যে বিষ উদ্গীরণ করে প্রধান। আংশিক সফল ও হয়; কেন না, সুলতান আলীর রক্তে সেই পুরনো নেশা ক্রমশই প্রকট হ'য়ে উঠতে থাকে, 'পাঁচ হাজার!'

'অনেক টাকা গো! ক্যাপ্টেন বেঁকে বসবে না তো?'

'মাথা খারাপ! রাজি করানোর দায়িত্ব আমার।'

'তুমি আমার খুব উপকারী বন্ধু গো!'

'তুমি তো শালা তা কোনদিন বুঝলে না।'

গুরুভার বিষাদে তাকিয়ে থাকবার মতন ওদের গমন পথ। নখরভরা থাবা শিবপ্রধানের এবং নরম কাঁদায় যেন গোলাম মহম্মদের বুকের ভেতরটা দৈ হয়ে আছে। বয়স্ক পুরুষরা যখন প্রেমের কারণে অসহায়, তখন শুধু স্বপ্নের মধ্যেই কাঁদে না, প্রকাশ্যেও চোখের জল স্পষ্ট হয়। শুধু সেই মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারাটাই আসল কথা। গোলাম মহম্মদ তাঁর জখমী বুকটা চেপে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পেরেছেন। পুরুষালী অশ্রু যতই জ্বালাময় হোক, খুব কৃপণ…।

ঐ আবছায়ায় ঢাকা বনের প্রান্তরেখাটুকু পার হলেই নাতিদীর্ঘ বালিয়ার শুরু। নৈশকালীন সমুদ্র ও ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের সতর্ক বাতিঘর দেখা যায়। সমুদ্রকে সমুদ্র বলে সনাক্ত করা দায়, শুধু তার গর্জন চারিত্রিক প্রমাণ দেয়। সেখানে ছোটবড় নানা আলো কাল্পনিক দিক্‌চক্রবাল পর্যন্ত ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি। বুঝি তারায় ভরা আকাশ মর্তভূমির মূলাংশ এসে ছুঁয়েছে!

বাতিঘরের বাতি উজ্জ্বলতর। ওখানকার অতিথিবৎসল কর্মীরা

লোকানুরঞ্জন গান ধরেছে। সার্চলাইটের আলো অনেক-অনেক দূর ছড়িয়ে আছে, সমুদ্রের বুক পরিষ্কার চাকচিক্যময়।

কিন্তু ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের মন আবছায়ায় ঢেকে আছে, তাঁর চোখের সামনে উর্বরা সুফলা কিছুই নাই—কেবল অজস্র ঝোপঝাড়, নিছক ঘেসো মাঠ।

প্রধানের ঘাড়ে হাত রেখে গোলাম মহম্মদ উচ্চারণ করেন, 'পাঁচ হাজার যে অনেকগুলি টাকা গো! কোথায় পাবো?'

অনুচ্চ জিজ্ঞাসা 'কোথায় পাবো?' কিন্তু এর রেশ চিরন্তন। বাতাসের হাত ধরে নেচে নেচে আসে সেই একই কথা, 'কোথায় পাবো?...কোথায় পাবো?...কোথায়...!'

গোলাম মহম্মদের শরীরের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে, কড়া চামড়ার বুট পরা সমর্থ পা ক্রমশই শ্লথ, সাদা কোর্তাটা ঘামে জব্‌জব্‌—কুচকে কুচকে বসেছে তার চওড়া বুক-পিঠের ওপর। বলিরেখাঙ্কিত মুখে বয়স বাড়ে। কাল তাঁর শ্রীহরণ করেনি, কিন্তু এই তাৎক্ষণিক ভাবনায় তাঁর বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে।

প্রধানের জ্বলজ্বলে চোখ, সাদা জায়গাটায় রক্তাভ আমেজ। শিকারীর শিকার সোহাগের মতন অভিব্যক্তি তার। টেনে টেনে বলে, 'চামার। আলী একটা আস্ত চামার। আপনার মতন উদার লোকের রক্ত চুষে খায় আর কি! শুনলে অবাক হবেন, ব্যাটা প্রথমে সাত হাজার চেয়েছিল। আমি নরমে-গরমে রাজি করিয়েছি পাঁচ হাজারে।'

ক্যাপ্টেন বলেন, 'আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো। গোলাম মহম্মদের সামর্থ্য কতটুকু। পনেরো বছর ধরে সমানতালে ডিউটি দিয়ে চলেছি। রোজগার মোটামুটি, অন্য লোকের চেয়ে খারাপ থাকি না। কিন্তু এই পোড়া দেশে সৎভাবে কেউ দুটো পয়সা জমাতে পারে?'

প্রধান বলে, 'সৎলোকেরা পারে না।'

গোলাম মহম্মদ বলেন, 'যেহেতু আমার রোজগারের দিকে কেউ হাপিত্যেশ করে চেয়ে নেই, আমি হয়তো কিছু টাকা জমাতে পারতুম। কিন্তু সেটাও সম্ভব হলো না, প্রতিমাসে ক'লকাতায় চাচাকে একগাদা টাকা পাঠাতুম বলে। আমার তো আপন বলতে ঐ এক চাচা। ভালোবাসলেও তিনি, না বাসলেও তিনি। হিসেবী লোক, মজতুরী কায়দায় প্রতিটি পয়সাকে কাজে লাগান।'

গোলাম মহম্মদ কথা বলা বন্ধ করেন। বাতিঘরের কাছাকাছি এসে গেছেন। বাতিঘরের নীচে প্রহরীর ঘরে রেডিওতে লঘু সঙ্গীত। ছেঁড়া ছেঁড়া ফেনিল ঢেউ বাতিঘরের নিরেট পাথুরে দেহ আঘাত করে, ধূসর ময়লার স্তূপ পেঁজিয়ে ওঠে ডানা মেলে।

প্রধান বলে, 'চাচার কাছে তো এখন হাত পাততে পারেন।'

মহম্মদ মাথা নাড়েন, 'অসম্ভব। হাত পাততে পারবো না। তাছাড়া চাচা তো আমার রোজগার জমিয়ে রাখেন নি,—বেলেঘাটাতে আর একখানা বাড়ি তুলেছেন, তুটো ঘর, একটা ভাঁড়ার, একটা বারান্দা। বলেছিলেন,—শাদী কর, তারপর এই বাড়িতে সংসার পাতবি।'

মেরুজ্যোতির প্রথম ঝলকের মতন হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ। সেই হাসি চাপা কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের মতন। আর একবার চোখের লোনা জলকে চেপে রাখতে পারলেন তিনি।

৮

....

[ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং/গোলাম মহম্মদ শাদী করলেন।]

ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং।

ঠিক ক'টা ঘণ্টা বাজলো, বলতে পারবো না। আমি পারবো না, রামশঙ্কর চক্রবর্তী পারবে না, গোলাম মহম্মদ পারবেন না, ঘুমন্ত হাসিনা পারবে না।

হাসিনা যেমন ঘুমিয়ে আছে, আমরাও তেমনি যথার্থ জেগে নেই। সামনা-সামনি বসে আছি ঠিকই, স্নায়ুগুলি এই মুহূর্তে অপার্থিব প্রেমের জগতকেই প্রাধান্য দেয়, কে যেন কানের কাছে বলে—আমি তাকিয়ে আছি তোমার দিকে, তোমার রহস্যময় দৃষ্টির দিকে, তোমার এলায়িত চুলের দিকে, তোমার গোলাপী ছোট্ট হাতের দিকে।

কী নরম গোলাপী আলোয় ক্রমশ তলিয়ে যাওয়া তিন মূর্তি আমরা! আমার ইচ্ছে হয়, ক্যাপ্টেনের হাত চেপে ধরে কিছু একটা আবেগ প্রকাশ করি; বিশেষত, এই সময় বড় দুর্লভ, যখন সত্যি বর্তমান ঘুমিয়ে থাকে, অতীত জেগে ওঠে।

প্রেমের সহচর বিরহ। সেই বিরহের মখমল অতিক্রম করবার সময়ই হঠাৎ গোলাম মহম্মদের স্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে। দারুন বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছেন ঘুমন্ত হাসিনার দিকে, যে হাসিনা এখন আমাদের দিকে মুখ করে এবং আপেক্ষিক অর্থে তাকে একটি সুন্দরী বালিকা বলে মনে হয়। যতক্ষণ সে জেগে ছিল, ধরতে পারি নি, এখন দেখছি হাসিনার মুখচ্ছবিও যথার্থ সুখী জনের নয়; একটা সূক্ষ্ম বেদনাময় আভা ছড়িয়ে আছে।

ক্যাপ্টেন বলেন,—'অল আর কোয়াইট ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড। রাত গভীর হয়, সকলে ঘুমিয়ে পড়ে।'

ক্যাপ্টেন থামেন। চোখ দুটো তাঁর বুজে আসে। চিরন্তন সত্য—রাত গভীর হয়, সকলে ঘুমিয়ে পড়ে। আরণ্যক অঞ্চল, বনহীন সমতল—সর্বত্রই ধীরে ধীরে দেখা দেয় পৃথিবীর আদি তুন্দ্রাঞ্চল।

ক্যাপ্টেন চোখ খোলেন, মুখও খোলেন, 'রাত গভীর হয়, সকলে ঘুমিয়ে পড়ে।'

রাত হলে আমিও ঘুমকে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু তফাৎ আছে। আর সকলের মতন ঠিক ঘুমেরই জন্য আমি কোন আরামদায়ক ব্যবস্থা খুঁজি না। আমি জাহাজে ঘুমোই। হাসিনা হাত-পা ছড়িয়ে শুতে ভালোবাসে বলে আমি অনেক রাতে শূন্য মেঝেতে গড়াগড়ি যাই।

হাসলেন। সস্নেহে তাকালেন হাসিনার দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ কেমন যেন এক ধরণের হতাশার ছায়া ফেলে তাঁর ওপর। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বাট এ্যাট এনি টাইম সি মে বিট্রে মি!'

নেশায় আচ্ছন্নতা সত্বেও চমকে উঠি।

ক্যাপ্টেন এ কথা বললেন কেন?

হাসিনার দিকে দৃষ্টি রেখেই উচ্চারণ করেন, 'সুন্দরী নারী আর কৃতি পুরুষ—এদের কাছ থেকে একনিষ্ঠ প্রেম ও আনুগত্য আশা করা যায় না। কি বলেন?'

বলেই আমার মুখের দিকে ফিরলেন।

আমি বলি, 'পৃথিবীতে এরকম বহু চালু প্রবাদ আছে। যেমন চাণক্য বলেছেন, স্ত্রী-জাতি ও রাজাদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই।'

ক্যাপ্টেন বলেন, 'জীবনের শিক্ষাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আমার সে রকম কিছু শিক্ষা হয়েছে। তবে ঘুম আমার হয়। আমি

জাহাজে ঘুমাই, আমি কখনো জাহাজ থেকে নেমে শৈলস্তরের মুখে শুয়ে থাকি, কখনো চড়ায় পড়ে আছি উদোম শরীরে আকাশের তুহিন তারাদের নিচে। আমি যতই নিজের বুকে টোকা দিতে দিতে অনুভব করি, আমি সাধারণ পার্থিব জন নই, ততই দুনিয়ার যত নোংরা ক্লান্তি আমার গাময় বেয়ে উঠতে থাকে, পাপ আমায় অবসন্ন করে দেয়।'

ক্যাপ্টেনের প্রলাপ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপের মতন।

'আমি খুব সৎ মানুষ ছিলাম। সমুদ্র মানুষকে সহজে পাপের পথে নামায় না।'

মানুষ ডাঙায় নেমে সেই পাপ বুকে করে আনে। পাপের বাসা বড় হয়, জাহাজ রসাতলে যায়, জাহাজীরা কুৎসিৎ রোগে ভোগে, তখন সমুদ্র ভয়ঙ্কর হয়, প্রতিশোধ নেয়। আমি একজন ক্যাপ্টেন, যে ছিল সেন্ট পার্সেন্ট অনেস্ট। জমিনে নেমে পাপ বয়ে নিয়ে এলাম—রাবেয়ার যৌবন আমাকে পাগল করে দিল। প্রধানের ষড়যন্ত্রে সুলতান আলীর বায়নার কাছে বিকিয়ে দিলাম আমার সততা। টাকার জন্য আমি আমার কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে শুরু করি। অসাধু ব্যবসায়ীদের মাল-পাচারে সাহায্য করি। দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছি। প্রধানের বুক নিশ্চয় জ্বলে। কিন্তু সমুদ্রে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে যাবে, আমার ক্ষতি করবে—এমন ক্ষমতা কারুর নেই। পর পর তিন মাসে তিনবার ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডে আমার প্রেমিকার কাছে হাজিরা দিয়েছি। ওকে তখন অল্প-সল্প স্পর্শ করতে শিখেছি। সে যে কী অপূর্ব অনুভূতি, কথা সাজিয়ে তা ব্যাখ্যা করতে পারি না। প্রতিবারই প্রধানকে সঙ্গে নিতাম। প্রধান ক্রমশই কাঠ হয়ে যাচ্ছে। সে আগের মতনই পরিশ্রমী বটে, কিন্তু কথাবার্তা একদম বলে না। আর এক বিস্ময় সুলতান আলী,—আমাকে দেখলেই তার আড়ষ্টতা বাড়ে, কেমন যেন তোতলামিতে পেয়ে বসে।...

মাত্র তিন মাস, এই তিন মাসে পাপ ও অন্যায়ের খনি খোঁদল করে আমি পাঁচ হাজার রূপেয়ার মালিক। খাঁটি কিস্থালিট রাবেয়াকে কিনবো ঐ দামে। সুলতান আলী, শিবপ্রধান—দু'জনকেই চমকে দিয়ে শাদীর দিন ঠিক করে এলাম। দারুন খুশী রাবেয়া।

বেহুঁশের মতন ছুটে এসে নিজেই চুমু খেয়েছে আমাকে। দিলখুশ আমি কোকো দ্বীপের বালুচরে খোয়াব দেখতে থাকি; আর তখনই ঘটলো সেই ঘটনাটা —'

* *

*

স্তূপাকৃত পাথর, মাটি, বালি ও হরেক জাতের জঞ্জাল জমে জমে সমুদ্রে চড়া জাগে, প্রাথমিকভাবে চাঙড়ায় বাসা বাঁধে শ্বাপদরা, ক্রমে দেখা দেয় আরণ্যক বিস্তার, তারপর বন কেটে বসত অর্থাৎ, প্যারামাউণ্ট মানুষের জয়যাত্রা—এই বিবর্তনের ইতিহাস আন্দামানের অসংখ্য দ্বীপের অন্যতম কোকো দ্বীপেরও।

এখনো সেখানে চড়া পেরিয়ে বন, যেখানে পাখির ডাকের সঙ্গে তক্ষকের মাথাকুটানি অশ্রুত নয়। সারি সারি গাছ-গাছালি, নারকেলবীথি ঘেরা দ্বীপ কোকো, এখানেও জেটি আছে, স্টিমার-লঞ্চ নোঙর পাতে, ট্যাগ 'মহল' নিশ্চল হয়।

রাতজাগা রক্তের ছিট্ লাগা ভেজা ভেজা চোখে গোলাম মহম্মদ স্নায়ুযুদ্ধে ঈষৎ ক্লান্ত, কদাচিৎ উত্তেজিত, সফল মানুষের যা হয়।...

রীতিমত ঠাণ্ডা জমেছে, যদিও সূর্য অকৃপণ এবং বিশাল বালুবেলা মানুষের শ্রান্তি দূর করে, ঘুমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ক্যাপ্টেনের পোশাকে আজ বৈচিত্র্য আছে। ছোট্ট শাদা সার্ট আর লাল রং এর হাতকাটা গেঞ্জি পরে অন্তঃশীলা জলে ভেজা প্রায় তরল বালুবেলার ওপর টান টান শুয়ে আছেন। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, শিকার-সন্ধানী আপাতঃ আড়ষ্ট কোন কুমীর চড়ায় উঠে

ভেক ধরেছে বুঝি। কখনো সমুদ্র ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে ওঠে, কখনো বা ফোঁপায়!

নিছক অন্তর্বাসের মতন এই পোশাক পরে ক্লান্ত ও উত্তেজিত স্নায়ুকে প্রশ্রয় না দিয়ে আজ বহুক্ষণ সমুদ্রে সাঁতার কেটেছেন গোলাম মহম্মদ, সুশৃঙ্খল ঢেউয়ের গর্জনে কখনো কখনো মুখ তুলেছেন, কখনো দিয়েছেন ডুব, সমুদ্রের পাড়ে জটলা পাকানো আদিবাসী শিশুদের দৃষ্টিতে তিনি তখন নেহাতই জলার ভূত। গোলাম মহম্মদের যেন বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, না হলে কেউ অতক্ষণ ঢেউয়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে! এখন অবশ্য প্রকৃতিস্থের মতন শুয়ে চোখ বুজে সূর্যের মনোরম উত্তাপ উপভোগ করছেন; বন্ধ-চোখের পাতাতেও সূর্য কোন অষ্টভুজ স্ফটিক।

পিছনে, চড়ার শেষে অগভীর বনে স্থানীয় আদিবাসীদের বিচিত্র বুনো উৎসব চলেছে, যে উৎসবে অগ্নিকে উপহার দেওয়া হয় হরেক জাতের পশুর টাটকা রক্ত; বটুয়া, বর্শা আর তীর-ধনুক নিয়ে মুখময় সাদা উল্কি আঁকা মরদরা কম্পজ্বরের কাঁপুনি নিয়ে আগুনের চারপাশে বৃত্তাকারে নাচে, মাদল বাজে যেন পরিক্রমন রত অশ্বমেধ ঘোড়ার দুলকি-চালে।

এখানেও, গোলাম মহম্মদের নাকের কাছে সেই টাটকা রক্ত-পোড়ার ঘ্রাণ, কদাচিৎ বাতাসের দাপটে তা ঝোড়োতে রূপান্তরিত, অতি প্রাচান গোষ্ঠীপ্রধান মানুষদের রোমান্সে গোটা পটভূমি আচ্ছন্ন, নৃতাত্বিক রহস্য যেখানে আজো দিন গোনে।

দীর্ঘদিনের দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে সুখীজন মনে হয় গোলাম মহম্মদের। হিংস্র নির্মম শর্ত-পূরণের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন! রাবেয়া-লাভের প্রয়োজনীয় কড়ি এখন তাঁর কাছে আছে।

'আমার এ সুখ আমারই সুখ; এ সুখ সকলের জন্য নয়। যেহেতু ন্যায় ও অন্যায়ের দুরূহ ভেদরেখাটি আমি প্রায় মুছে ফেলতে

পেরেছি, আমার বিবেক জ্বলুনি ধরাচ্ছে না। রাবেয়াকে আর স্বপ্নে তল্লাস করা নয়, রাবেয়া এখন আমার কাছে সুখকর বাস্তব সত্য।...'

মেজাজ চমৎকার।

চমৎকার মেজাজ সমুদ্রের, সাদা চরের, আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের, আদিবাসী জোয়ানদের এবং টান টান শায়িত গোলাম মহম্মদের। বন আর টিলাগুলির মাথায় মাথায় মৌচাক বেঁধেছে মৌমাছিরা,—ওদের গুনগুনানিতে মেজাজ আরো শরীফ হয়। এত খুশীতে কে কার ভারসাম্য রাখে।

'...জব্বর শীত পড়বে এবার ; এই শীতেরই গোড়াতে রাবেয়াকে আমি বিবি করবো। শাদীর পর জল-স্থল চষে বেড়াবো ; কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিণে যাবো আমরা ; এমন অনেক গহনে অনুপ্রবেশ করবো যেখানে আগে পদপাত ঘটেনি মানুষের। সুযোগ পেলেই দু'জনে স্নান সারবো মহাসমুদ্রে, স্নান-শেষে খুঁজবো বিচিত্র রং ঝিনুক ও লাল কাঁকড়া।...'

ক্যাপ্টেন চোখের ওপর হাত রাখলেন।

আর ঠিক তখন আনন্দ থেকে সর্বনাশ এক হাতের ফারাক।

সর্বনাশ গোলাম মহম্মদের নয়, সর্বনাশ একটি আদিবাসী বাচ্চা মেয়ের।...

হঠাৎ কচি গলার আর্তনাদে চমকে ওঠেন ক্যাপ্টেন। উঠে বসেন। ঘুরে তাকিয়ে দেখেন, আদিগন্ত লোনা জলের মেলায় একটা পরিণত পরাজিত ঢেউ তীর বেগে ফিরে যাচ্ছে, যার সফেদ ফেনিল অন্তর থেকে উত্থিত একজোড়া অসহায় ছোট হাত যেন শেষ বারের মতন সূর্য প্রনাম করছে।...

আদিবাসী শিশুদের চিৎকার সকলকে সচকিত করে।

নৃত্যরত আদিবাসীদেরও দু'একজন ছুটে আসে...কিন্তু সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়েই কেমন যেন কুঁকড়ে যায় তারা। আর তখনই

বিদ্যুৎগতিতে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন গোলাম মহম্মদ : বাচ্চাটাকে বাঁচাতে !

সীমাহীন জলের ঢ্যাপ ঢেপে আছাড়ি পিছাড়ি, ছল ছল শব্দ।…আধা স্যাংটা শঙ্কিত মানুষগুলির দিকে চেয়ে হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। ন্যাকড়ার পুতুলের মতন নরম মিশকালো আদিবাসী শিশুটি তাঁরই কোলে। সমুদ্র কোন কিছুকে অত সহজে গ্রহণ করে না, সমুদ্র নিরপরাধকে শাস্তি দেয় না, নিছক রসিকতা করে মাত্র।…

দ্বীপের আদিবাসীরা, যারা তাদেব পাথর দেবতা বসানো ডুলিটা বনের মধ্যে ফেলে রেখে ছুটে এসেছে, বিস্ময়ে পুলকে বুঝি উদ্ধার কর্তা জ্যান্ত সমুদ্র দেবতাকে দেখছে। দেবতার পরনে আগুন রং পোশাক, হাসিতে অপরিমিত উল্লাস।

আদিবাসীদেব সর্দাব, যার ব্যক্তিত্ব গম্ভীর, বয়সে প্রৌঢ় ও যার গলায় হরেক রঙের রাজ্যের পুতি ও কড়ির মালা, মাটিতে বর্শা নামিয়ে উল্কি আঁকা নিগ্রোবাটু মুখে নিজের কৃতজ্ঞতা জানান—ঐ শিশুটি যে তাঁরই !

আদর আর খাতিরের তুঙ্গে পৌঁছে গেলেন গোলাম মহম্মদ। আদিবাসীরা তাঁর কোন কথাতেই কর্ণপাত না করে হাতে হাত বেঁধে স্ট্রেচার বানিয়ে ফেলে। তারপর সেই স্ট্রেচারে মহম্মদকে শুইয়ে সোজা নিয়ে যায় নিজেদের গ্রামে।

গ্রাম মানে পনেরোটা কুঁড়ে,—এমন ক্ষুদে যে মনে হয় এক একটা স্লিপিং ব্যাগ বুঝি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। সর্দারের কুঁড়েতে ধনেশ পাখির হাড় সাজিয়ে যেন চিরকুট লেখা হয়েছে।

ওখানেই ক্যাপ্টেনকে বসিয়ে বীরের সম্মান দেওয়া হলো।…তারা তাঁকে রঙ্গা পাখি মেরে মাংস খাওয়ায়, আধকাঁদি কলা আর প্রচুর নারকেল নামিয়ে রাখে তাঁর পায়ের কাছে। রাতে যদি

সেই দ্বীপে থাকতে চাইতেন মহম্মদ, একটি যৌবনবতী আদিবাসিনীকেও পেতেন সেই রাতের মতন। কিন্তু রাজি হননি। তাঁর মনে তখন অন্য বাসনার স্থান নাই, অকপট প্রেমে লক্ষ শুধু এক দিকেই—ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডে রয়েছে যে প্রেয়সী, রাবেয়া!

বিদায় দেবার সময় সর্দার একখানা ধারালো বটুয়া উপহার দেন ক্যাপ্টেনকে! প্রথাসিদ্ধ গাম্ভীর্যে তিনি উচ্চারণ করেন: শক্তিমান, মহীয়ান পুরুষ! যদি কখনো নিষ্ঠুর শত্রু আপনাকে বাগে পায়, এই মন্ত্রপূত অস্ত্র সেই দুশমনের সর্বনাশ করে ছাড়বে।

স্মিত হেসে হাত বাড়িয়ে বিচিত্র গঠন অস্ত্রটি গ্রহণ করতেই ক্যাপ্টেনের রক্তে যেন হঠাৎ তুষার ঝড় শুরু হয়। এক ধরণের আত্মবিশ্বাসে ক্যাপ্টেন কোন গোপন শক্তি অনুভব করেন। এ অস্ত্র শুধু অস্ত্র নয়, দৈবের বরাভয় মুদ্রা। একদিন এই বটুয়া তাঁকে উদ্ধার করবে।...

কলার কাঁদি আর লতা দিয়ে বানানো নারকেল ঠাসা থলে কাঁধে নিয়ে তিন জন আদিবাসী যুবক চলেছে গোলাম মহম্মদকে ট্যাগ 'মহল'-এ তুলে দিতে। ক্যাপ্টেনের হাতে সেই বটুয়াখানা —সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত। আদিবাসী তিনজনের হাঁটার ভঙ্গী দেখলে মনে হয়, ওরা যেন খোঁড়াচ্ছে। আড়াআড়ি বালুভূমি পাড়ি দিয়ে জেটির কাছে পৌঁছতে হবে। বেলা ঢলে পড়ছে। সামনেই ঘোর শৈত্যময় সন্ধ্যা ও রাত্রি।...

জাহাজে উঠেই কিচেন-মাষ্টারকে দিয়ে ক্যাপ্টেন জল গরম করান, আদিবাসী তিনজনকে চা খাওয়ান। তারপর ওরা চলে গেলে ডায়েরী লিখতে বসেন।...আজই শেষ রাতে 'মহল' নিয়ে ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের দিকে রওনা দেবো। এবং কাল থেকেই পরমাশ্চর্য রাবেয়া আমার সঙ্গ আর ছাড়বে না। বেশ কিছুদিন যাবৎ শীতকে পেছনে রেখে পালাচ্ছি, রাবেয়া এলে দু'জনে মিলে

শীতকে গরম করে ছাড়বো। কিন্তু আমার এই প্রেমের দূত শিবপ্রধান ইদানীং কেমন যেন নিস্পৃহ। আমি ওর সঙ্গে কর্তা সুলভ ব্যবহার করি না। বরং প্রতিদিন খাবার টেবিলে একই সঙ্গে খেতে বসি আমরা।...

ডায়েরী লেখা বন্ধ করে বেল বাজান ক্যাপ্টেন। সুদেহী সুপুরুষ কিচেন মাষ্টার ভৈরব ফনী এসে দাঁড়ায়।

ক্যাপ্টেন [ডায়েরীটা বালিশের নীচে রাখতে রাখতে] : আজ কি রান্না হচ্ছে ?

ভৈরব ফনী : পরোটা আর টার্কি পাখির রোস্ট।

ক্যাপ্টেন : মালের বোতল আছে তো ?

ভৈরব ফনী : না স্যর, মোটে আধ বোতল পড়ে আছে।

ক্যাপ্টেন [চমকে] : হোয়াই নট ফুল বোটল ?

ভৈরব ফনী : এক বোতলই ছিল, সারেং এসে আধ বোতল উড়িয়ে দিলে।

ক্যাপ্টেন [গলার স্বরে ঝাঁজ] : তুমি এলাউ করলে কেন ?

ভৈরব ফনী : আমি নতুন লোক স্যর, জাহাজের নিয়ম কানুন সব জানি না...।

ক্যাপ্টেন : অল রাইট। আজ থেকে আমার পারমিসান ছাড়া কিচেনের মজুদ বেহাত করবে না।

ভৈরব ফনী : ইয়েস স্যর।

ক্যাপ্টেন [কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর] : সারেং কোথায় ?

ভৈরব ফনী : বোধ হয় খোলের কাছে।

ক্যাপ্টেন : ওকে একবার ডাকো।

ভৈরব ফনী কেবিন থেকে বেরিয়ে তরতরিয়ে নেমে যায়।

খোলের কাছে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারেং শিবপ্রধান। গত তিন মাসে তার চেহারার অনেক পরিবর্তন

ঘটেছে ; তাকে আর আগের মতন বলিষ্ঠ মনে হয় না, চোখ-মুখের কাঠিন্য অনেক বেড়েছে ; আধ বোতল রাম খাবার ফলে দুই চোখে মিটমিটে নেশাতুর আভা। ভয়ানক রুক্ষ চুল এলো মেলো, শিরাময় দুই হাত ও দশ আঙুল যথার্থই হিংস্র।

'সারেং, ক্যাপ্টেন তোমায় ডাকছেন।'

—ভৈরব ফনী পিছন থেকে এসে বলে।

শিবপ্রধান ঘুরে তাকায় না।

'সারেং, শুনছো, ক্যাপ্টেন তোমাকে তলব করেছেন।'

—ভৈরব ফনী জবাব না পেয়ে আর একবার তাগাদা দেয়।

'শুনেছি, তুমি তোমার কিচেনে যাও,' ঘুরে না তাকিয়েই কঠিন গলায় শিবপ্রধান বলে, 'ক্যাপ্টেন বলেছেন আর একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে ছুটে এসেছেন। যতসব পা চাটা কুত্তা!'

সারেংয়ের অনভিপ্রেত আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে যায় ভৈরব ফনী ; কিন্তু পরমুহূর্তে তীব্র জ্বালা সঞ্চারিত হয় তার কোষে কোষে। নিজেকে পীড়িত অপমানিত লাগছিল তার। বিশাল শরীর নিয়ে রুখে দাঁড়ায় সে, 'সারেং, মুখ সামলে কথা বলবে।'

এতক্ষণে ঘুরে তাকায় প্রধান, 'কার ভয়ে ?'

'মানুষের ভয়ে। আমরা সকলেই মানুষ আমাদের প্রত্যেকের আত্মসম্মান আছে।'

'আত্মসম্মান, দাঁত খিচিয়ে ওঠে প্রধান, খালাসী বাবুর্চি এদের আবার আত্মসম্মান!'

ভৈরব ফনীও পাল্টা কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই ওপর থেকে ভেসে আসে ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের সজাগ স্বর, 'আর তর্ক করতে হবে না। দয়া করে মনে রেখো, জাহাজটা মাছের বাজার নয়। প্রধান, আমি তোমায় ডাকছি।'

মুখ উঁচু করে শিবপ্রধান ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদের গর্বিত মুখাবয়ব দেখে। দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করে জবাব দেয়, 'যাচ্ছি।'

'এখনই এসো আমার কেবিনে।'

—ক্যাপ্টেনের মুখচ্ছবি মিলিয়ে যায়।

প্রধান কিন্তু তখনই সিঁড়ি বেয়ে ওঠেনা। ভৈরব ফনী সরে যেতে খোলের কাছে পড়ে থাকা এক টুকরো সাদা কাগজ তুলে নেয়; নখ দিয়েই কি যেন আঁকিবুকি কাটে তাতে, তারপর সেই টুকরোটা উড়িয়ে দেয় সমুদ্রের দিকে। ঝুলন্ত দড়ির সিঁড়িটাকে দুই হাতে বারকয়েক ঝাঁকুনি দেয়।

এক ডেলা ঘন থুতু পাটাতনে ছিটিয়ে শিবপ্রধান ওপরে উঠতে থাকে।...

গোলাম মহম্মদের কেবিনের দরজায় শিবপ্রধানের ছায়া।

বহুদিন বাদে মহলের ক্যাপ্টেন তাঁর কেবিনে বসে পাইপ ধরিয়েছেন। সাধারণত তিনি চুরুট অথবা সিগ্রেট খান, পাইপ ধরান কদাচিৎ,—জন্মদিন টন্মদিন অথবা, কোন চটকদার পার্টি-টার্টি হলে তাঁর মুখে ঐ পাইপ দেখা যায়। ধোঁয়ার বাদামী রেখাগুলো মুখেরই চারপাশে ঘুরছে ফিরছে। তার চোখ জ্বল জ্বলে—সাদা জায়গাটায় ঈষৎ নীলাভ আমেজ।

'আমায় ডেকেছেন?'

'ইয়েস, কাম ইন।'

ঘরে ঢোকে সারেং।

জীবন্ত তাজা চোখদুটি নাচিয়ে ক্যাপ্টেন একবার তাকে আপাদ-মস্তক দেখে নেন। তারপর সরে গিয়ে চোখ রাখেন পোর্টহোলে। গাণিতিক নিয়মে সমুদ্রের রং দ্রুত পরিবর্তনশীল,—ক্রমশই শ্লেটের মতন কালি গোলা। ক্যাপ্টেন বর্তমান আবহাওয়াকে বেশ ব্যাখ্যা করে বোঝান: ডিসেম্বর শুরু হতে না হতেই ভুতুরে ঠাণ্ডা। আজকাল সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে! ঠিক শীত শীত করে না, অথচ মেরুদণ্ডের ভেতর যেন দাঁত বসাচ্ছে।'

প্রধান স্থানু গতিহীনতায় সামান্য দুলে ওঠে, কিন্তু কোন মন্তব্য করে না।

ক্যাপ্টেন পোর্টহোল থেকে চোখ তুলে নেন, ঘুরে তাকান, আর একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন প্রধানের। চেহারায় ভিখারী অথবা ডাকাত। ক্যাপ্টেন দাঁতে চেপে আছেন তাঁর বাহারী কমলা রং পাইপটা। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসেন, 'কি নেশা এখনো কাটেনি?'

প্রধান যেন অবাক হয়, 'নেশা?'

ক্যাপ্টেনের চোখ যেন ঝলসে ওঠে, 'অবাক হলে যে! আধ বোতল রাম হজম করা তো সহজ নয় হে!' প্রধানকে এবার জোর করেই হাসি টানতে হয়, 'স্যর, আধ বোতলেও আমার নেশা হয় না।'

চোখ ওপরে তোলেন ক্যাপ্টেন, 'বটে! গোটা বোতলটাই তবে তোমার দরকার ছিল। ইস, কিচেন-মাষ্টার কেন যে তোমায় আধখানা দিলে!'

পরিষ্কার বিদ্রূপের ধাক্কায় আবছা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে প্রধান, ঠিক যুৎসই কোন কথা খুঁজে না পাওয়ায় ডান হাত দিয়ে বা গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলিকে অনুভব করে।

তখনই হাত নেড়ে নেড়ে কিছু যেন একটা তাড়াবার পর হঠাৎই ইস্পাতখণ্ডের ঠোকাঠুকির মতন শানিত হয় গোলাম মহম্মদের কণ্ঠস্বর, 'তোমায় আমি একটু প্রশ্রয় দিই ঠিকই, খাবার টেবিলেও তোমাকে রোজ ডেকে আনি, কিন্তু তার মানে এই নয় তুমি ক্যাপ্টেনের মালের বোতল হাতাবে। তুমি কি ভাবো, মহলের ডিসিপ্লিন ভাঙবার অধিকার তুমি অর্জন করেছো?'

শিবপ্রধান ঝড়ের মুখে পাতার মতন কেঁপে ওঠে: 'স্যর!'

গোলাম মহম্মদের স্বর পূর্ববৎ: 'নিজের কাজে যাও। আমি এখনই 'মহল' ছাড়বো।'

প্রধান তবু নড়ে না।

'যাও।'

'জাহাজ ছাড়ার এখন তো সময় নয়।'

'আমি যখন বলছি, তখন এখনই সময়। ক্যারি অন। রাত শেষ হবার আগেই মাই ট্যাগ উইল রিচ ইস্টার্ন আইল্যাণ্ড। তারপর কাল শুক্রবার, শুভদিন—রাবেয়াকে আমার ট্যাগে তুলে আনবো।'

গোলাম মহম্মদের স্বর গমগম করতে থাকে।

প্রধান আর একবার কেঁপে ওঠে, রীতিমত বিচলিত সে, 'কিন্তু স্যর, আমীকে তো খবর দেওয়া হলো না। বিয়ের বন্দোবস্ত—'

'নো নিড অফ, দ্যাট ফর্মালিটি। তোমার দোস্ত রূপেয়া চেয়েছিল। রূপেয়া আমি যোগাড় করেছি। ব্যস, কনট্রাক্ট ইজ ফুলফিল্ড, আর কোন ঝামেলা পোহাতে রাজি নই।'

গোলাম মহম্মদ তখন সত্যই জাঁদরেল ক্যাপ্টেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের ঝঙ্কারে ক্ষুব্ধ সারেং ঠিক জবাব খুঁজে পায় না। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং দেখে, গোটা আকাশের মানচিত্রে একখণ্ড ঘোরকৃষ্ণ মেঘ ক্রমশই সিংহ বিক্রমে তেড়ে আসছে। কাঁপা আওয়াজে প্রধান বলে, 'স্যর, ঝড় উঠবে। এখন এঞ্জিন চালু করা কি ঠিক?'

কেবিন থেকে জবাব দেন গোলাম মহম্মদ, 'ঝড়ের সম্ভাবনা আমি আগেই টের পেয়েছি। কিন্তু এঞ্জিন চালু হবেই। ফর মাই সেক, জাহাজ চলবেই! মনে রেখো, কাল শুক্রবার—শুভদিনে আমার সুখ আসছে।'

খুব জোরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে শিবপ্রধান : আর কোন অপত্তি জানায় না।

ঝড় আরম্ভ হবার মিনিট দশেক আগে নিরাপদ জেটি ছেড়ে বিপদ-সংকুল মাঝ সমুদ্রে এসে হাজির হয় 'মহল'।

এই দশ মিনিটে প্রাকৃতিক প্রস্তুতি শেষ। ঝড় আসে। বৃষ্টির

শব্দ শুনতে পান গোলাম মহম্মদ। অসময়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে, এলো মেলো বাতাস ছুটতে ছুটতে আসছে, আছড়ে পড়ছে। বাতাসের উস্কানিতে ছোট ছোট ঢেউ ক্রমশই বিশাল ডাকসাইটে হয়ে ওঠে। প্রতিটি মুহূর্ত এই জলযান সামুদ্রিক চড়াই উৎরাই অতিক্রমনরত। জাহাজে বাতিগুলির ম্লান আলো আরো অস্পষ্ট। শব্দের উত্থান-পতনে যেন শিলাবৃষ্টির ঝাঁজ। চারি পাশে সাদা দৈত্যরা দাঁত বের করে ছুটে আসে। অভিক খালাসীরা সমস্বরে দোহাই পাড়েঃ আল্লা-আল্লা নমি···দরিয়ার পীর, বদর-বদর···।' এই একই প্রার্থনা পূব বাংলার ভয়ংকর নদী-নালাতেও।

এঞ্জিন ঘরে দারুণ চাঞ্চল্য।

এঞ্জিনীয়ার শরিৎভূষণ হঠাৎ কেমন অসুস্থ বোধ করছে; তার কানের কাছে একটানা কোন মোলায়েম শব্দ, পেটের মধ্যে তার কুলকুল ডাক, ঠেলে বমি আসছে। নিঃশ্বাস নেওয়াটা পর্যন্ত কঠিন।

খালাসীদের মনে বিস্ময়; বিস্ময় থেকে ভয় এবং ভয় থেকে চাপা অসন্তোষ—ক্যাপ্টেন হঠাৎ এই ঝড়ের মুখে ট্যাগ ছেড়ে দিলেন কেন? কি যুক্তি থাকতে পারে?

এখন তো জাহাজ ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় নয়! কোম্পানীর আইনও ভাঙ্গা হচ্ছে এতে!

কোন যাত্রী নাই, কোন মাল-পত্রের ওঠা-নামা নাই, হঠাৎ ঝড়-বাতাস-ঢেউ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কোকো ছেড়ে ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডের দিকে ছুটছে জনকয়েক খালাসী ও তাদের তুঘলগী-মেজাজের ক্যাপ্টেন। আশ্চর্য!···রশি টানতে টানতে সুকানীর ডান হাতটা একেবারে বেঁকে ধনুক হয়ে গেল! বয়লারে কয়লা ঠেলতে ঠেলতে দুই ফায়ার ম্যানের মুখ বিকৃত। প্রচণ্ড ঝাপটা সামলাতে সামলাতে অভিজ্ঞ সারেংয়ের দুই চোখ থেকে আগুন ঝরছে। পাড়ায় মড়ক লাগলে যেমন ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যায়, তেমনি এক অবস্থা এই ছুটন্ত ট্যাগের সংগ্রামী অধিবাসীদের।···

বাইরে অভাবনীয় দাপাদাপি। নিঃশব্দে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করছে খালাসীরা।

আর তখন ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ নিশ্চিন্ত আয়াসে কেবিনের বাংকে শুয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে দেখছেন, একটা দিশাহারা গ্যাণ্ডফ্লাই এ ঘরে ঢুকে চক্কর খাচ্ছে। গোটা জাহাজশুদ্ধ মানুষ যখন ভিজছে, শীতাহত প্রত্যেকের মুখে যখন গভীর হতাশা ও ক্ষোভ, আর তখন তাদের নেতা আবেশে দুই চোখ বুজলেন, যেন স্বপ্ন দেখছেন। বুকের কাছ থেকে ঠেলে আসা স্বপ্নময় শব্দগুলি উচ্চারণ করছেন, 'হোক ঝড়, আসুক বিপদ। আমি আজ বিশ্রাম নেবোই!'

আমি কঠোর দায়িত্ব সম্পন্ন, কিন্তু আমার প্রেম তার চেয়েও বড়।...কাল এ সময়ে এই কেবিন আলো করে থাকবে রাবেয়া।... আমি তো এক দিনে তরুন হলাম! সংযমের দেয়ালগুলি ভাঙ্গছে!...'

ঝড়ের সঙ্গে একটানা লড়াই চালিয়ে 'মঙ্গল' যখন ইস্টার্ন থাইল্যাণ্ডের জেটিতে আশ্রয় নিলো, রাতের মেয়াদ তখন ফুরিয়ে এসেছে এবং সমুদ্রও শান্ত। ওয়াচের খালাসীরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে এঞ্জিন-রুমেই শয্যা নিয়েছে, কারো মুখে রা নেই, শান্ত সমুদ্রে এ সময়ে ডলফিনের ঝাঁক দেখেও কেউ উল্লাস প্রকাশ করে না; তখন আকাশ মেঘমুক্ত বলে অজস্র তারাদের একটি-দুটি ফুটতে থাকে এবং ঐ সময়ই প্রথম টের পাওয়া যায়—, আজকের রাতটা ছিল শুক্ল জ্যোৎস্নার!

আলোর পাতগুলি শান্ত সমুদ্রে রাজহাঁসের মতন সাঁতার কাটছে। বাতাসের দাপট নেই বললেই চলে, তবু গ্যাঙওয়েটা মেয়েদের ঢিলে ঢালা স্কার্টের মতন দুলছে।

চিমনির কাছ থেকে যুদ্ধ-ক্লান্ত সারেং সরে আসছে। সুকানী, য়ার্ড, বা অন্য কেউ খেয়াল করছেনা তাকে। এখনো তার জামা

প্যাণ্ট ভিজে সপ্ সপে। বা পা-টায় বুঝি হিমাঘাত হয়েছে তার।' বৃষ্টি ভেজা স্যাঁতসেতে তক্তাগুলির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে সে' ক্যাপ্টেনের কেবিনের সামনে পৌঁছে যায়। আরো খানিকটা বুক ছেঁচড়ে গিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ে। তার দুই চোখে হায়নার হিংস্রতা। সেই হিংস্রতার দুইহাত প্রসারিত করে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয় সে। কিন্তু—

কিন্তু ঠিক তখনই তার দৃষ্টি কুচকে যায়, সে থমকে দাঁড়ায়। গোলাম মহম্মদের হাতে একটা বিচিত্র ধরণের অস্ত্র, যার চাকচিক্য এই আধো আলো আধো ছায়ায়ও চমকপ্রদ। ওটা ঠিক আয়নার মতন। সারেং যেন এতদূরে দাঁড়িয়েও নিজেরই মুখচ্ছবি দেখতে পায় এবং ভয়ে তার সর্বাঙ্গ থর থরিয়ে কেঁপে ওঠে। সে আবার বসে পড়ে। দূরে কোন নোঙর তোলা জাহাজের ভেঁপু শোনা যায়। বাতিঘর থেকে সঙ্গীতের ধ্বনিসম ঘণ্টা বিলম্বিত লয়ে বেজে চলেছে। এখন ভোর হলো। অব্যক্ত যন্ত্রণায় প্রধান নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে: ক্যাপ্টেন কি আমার দুশমনী টের পেয়েছে?··

৯

....

[আমরা খোলা ডেকে রাবেয়া চিনেছিল দুশমনকে।]

'কি মশাই, জাহাজ চলছে না বলে কি খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার?'
—গোলাম মহম্মদ আমাকে বললেন।

আমি হেসে বলি, 'কে বললে জাহাজ চলছে না? আমরা এতক্ষণ কোকো দ্বীপ, ইস্টার্ন আইল্যাণ্ড—কত জায়গা ঘুরে এলাম।'

চক্রবর্তীও হাসিতে যোগ দেয়, 'ঠিক। তোমার গল্প শুনলে জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারবে না।'

গোলাম মহম্মদ বললেন, 'ভুল বললে রামশঙ্কর। বরং তার জীবন সম্পর্কে ঔদাসীন্য বৃদ্ধি পাবে। অত বড় সমুদ্র, অত মহান বন—সেখানেও খালি পাপ আর দুশমনী। মানুষের মন শূকরের মাংসেরও অধম।'

ক্যাপ্টেন উঠে দাড়ান। টলতে টলতে কিচেনে ঢোকেন। ফিরে এসে দুই হাত তুলে বলেন, 'আমি এইমাত্র পাশের ঘরে আর্শিতে চোখ টেনে দেখলাম, বেশ নেশার ঘোর লেগেছে। এখন আর পাত্র পূর্ণকরা উচিত নয়, কি বলেন?'

আমি সমর্থন জানাই, 'না, আর নয়।'

ক্যাপ্টেন দাড়িয়ে দাড়িয়েই বলেন, 'আমি আমার চোখের নীচটাও টেনে টেনে দেখলাম। মাইরি, অনেক কালি জমেছে, মাংস ঝুলে পড়েছে, মাথার সামনেটা ন্যাকড়া পাথরের মতন। চক্রবর্তী, আমি কি খুব বুড়ো হয়ে গেলাম?'

চক্রবর্তী বলে, 'আরে না। বয়স বাড়লেই মানুষ বুড়ো হয় না; মানুষ বুড়ো হয় তার মনে।'

ক্যাপ্টেন হাসেন, 'সবাই সেটা বোঝে না। ওরা খালি বাইরেটাই দেখে, ভেতরটা বোঝে না।'

'বুড়োরা সাধারণতঃ ফুল ভালোবাসে না। আমি বাসি। আজো সন্ধ্যা বেলা আমি তিনগুচ্ছ ফুল এনে হাসিনার শরীরের তিনটে সেরা জায়গায় রেখেছিলাম। দুটি দুই স্তনে এবং শেষটি ওর সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে কুৎসিৎ চক্ষুহীন নাক-সর্বস্ব গহ্বর মুখে।'

হা-হা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন গোলাম মহম্মদ। আর এক তীব্র পাপ-বোধে আচ্ছন্ন আমি, ঘুমন্ত হাসিনার সেই তিনটি স্থানকেই কল্পনা করতে থাকি।

চক্রবর্তী শুধু চাপা ধমকের গলায় বলে, 'এই কি হচ্ছে। নিজের বিবিকে নিয়ে এমন নোংরা কথা।'

ঠোঁট ওল্টান গোলাম মহম্মদ, 'নোংরা কথা। শালা বুকের মধ্যে আগুন চেপে কামুকের দল দুনিয়া চষে বেড়ায়! সত্যি কথাতে গেলেই নোংরা হয়ে গেল। রহস্য টহস্য বুঝি না, সৃষ্টির মূল কোথায়? এ্যাঁ? চক্রবর্তী, তুমি জানো না? তুমি শালা বিয়ে করো নি বলে কি একেবারেই অজ্ঞ নাকি? আমার চেয়ে অনেক বেশী জানো। মনে আছে, সেবার পোর্টব্লেয়ারে এক পার-এ ঢুকে একটুখানি মদ খেয়ে মাতলামির ঢঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়েকে জাপটে ধরেছিল?'

চক্রবর্তী মাথা নাড়ে, 'শুধু জাপটে ধরিনি; ওকে একদিন ডেট দিয়ে আমার আলুর গো-ডাউনে এনে হাজির করেছিলাম। বড় কচি ছিল! আজো ভাবলে মায়া হয়।'

ক্যাপ্টেন যেন শান্ত হলেন, 'ইয়েস। কনফেস্ করো। সমুদ্রের ওপর দাড়িয়ে মিথ্যা বলো না। আমরা সব সমান। শুধু সুযোগের অভাব। এই যে আমার হাসিনা শুয়ে আছে; তোমার বন্ধু কি সুযোগ পেলে ওকে ছেড়ে দেবে? না, হাসিনা আমার মহব্বতের খাতিরে তোমার ফ্রেণ্ডকে রিফিউজ করবে?'

আমার শরীরের রোমকূপগুলি খাড়া হয়ে ওঠে। গোলাম মহম্মদের জিভে কি কিছুই আটকায় না? অথবা, মানুষটা কি সত্যদ্রষ্টা?

গোলাম মহম্মদ চক্রবর্তীর চেয়ারটা ঘুরে আমার পিছনে এসে দাড়ান, আমার কাঁধে হাত রাখেন, ঈষৎ আনত স্বরে বলেন, 'চলুন, এই কেবিন ছেড়ে বাইরে ডেকে গিয়ে দাড়াই। এ ঘরের বাতাস বড় ভারী ঠেকছে।'

তিনজনই উঠে দাড়াই।···

আমাদের পা টলছে।···

আমার দৃষ্টি আর একবার আটকে গেল ঐ বিচিত্র অস্ত্রটার ওপর—বটুয়া।···

তিনজনে আবছা ছায়ায় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে খোলা ডেকে এসে দাড়াই। আকাশ উদার, রূপো-গলা সমুদ্রে শৃঙ্গার-ধ্বনি। আমি আমার মগজের কার্যকারিতা বুঝবার জন্যই আকাশের তারা গুনতে থাকি—এক, দুই, তিন···ত্রিশ···আর নয়। এই তিনজনকে বাদ দিলে নির্জন ডেকে আর কোন প্রাণ চাঞ্চল্য নাই। মৎস্য শিকারী সারেংকেও আর প্রপলারের কাছে বসে থাকতে দেখা গেল না। বহুক্ষণ আমরা পরস্পর কোন কথা বলিনা। বলতে পারিনা। তারপর ক্যাপ্টেন হঠাৎ ডেকে বসে পড়লেন এবং আমরা আবার তাঁর একটানা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

'···তারপর দক্ষ হারপুনার গর্ভিনী তিমি শিকার ক'রে যেমন গর্বিত বোধ করে, আমারও মনে তেমনি এক অহংকার হরদম ব্যাণ্ড বাজিয়ে গান গায়। সাত রাজার ধন এক মানিক আমার কণ্ঠ-লগ্ন। বাতিঘরের দ্বীপে বন্দিনী রাবেয়া এখন আমার একান্তই নিজের—আমার বিবি। মাই ডার্লিং। বালি, পাথর ও ঘন বনময় প্রায় জনমানবহীন দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে এনেছি। রূপকথার চাইতেও রোমহর্ষক।···

রাবেয়া আমার বিবি ঠিকই, তবে প্রথাসিদ্ধ শাদী কিন্তু আমাদের হয় নি।

আমি একাই ঝড়ের গতিতে সুলতান আলীর হাতে পাঁচ হাজার টাকা গুনে দিয়ে সুন্দরীকে নিয়ে চম্পট। আলীর কোটরাগত চোখে অপরাধবোধের চিহ্ন; বিশেষ কিছু বলতেও যেন সাহস পায় নি। শুধু আমাদের পিছন পিছন জাহাজ-ঘাট পর্যন্ত ছুটে এসেছিল।

আদতে আমি তো সুলতান আলীকে ঘৃণা করতুম। আমার কাছে তার ভাবমূর্তিকে ইচ্ছামতো কদর্য করেছিল শিবপ্রধান। আমি মনে করেছি, লোকটার মন পচা আলুর মতন কদর্য, টাকার জন্য যে অনায়াসে নিজের বৌ ও মেয়েকে বেশ্যা বানাতে পারে।

কিন্তু রাবেয়ার হাত ধরে যখন আমি আলু পেঁয়াজের রসদ ঘর পার হ'য়ে ওপরে উঠছি, আলীর দুই চোখে ভয়াবহ হাহাশ্বাস ফুটে ওঠে। সম্ভবত সেই সময় ওর মতন অসহায় নির্বোধ লোক দুনিয়ায় দুটি ছিল না। কোন মানুষের দৃষ্টিতে অমন করুণ আর্তি সচরাচর দেখা যায় না। সে প্রথম প্রধানকে খুঁজেছিল: কিন্তু প্রধান তার সঙ্গে দেখা করে নি।

সে তখন নীচ থেকে চিৎকার করে বলেছিল, 'ক্যাপ্টেন আমার রাবেয়াকে সুখে রেখো।'

আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, 'আপনার কাছে যে সুখ পাচ্ছিলো তার চেয়ে শতগুণ বেশী সুখ পাবে।'

'রাবেয়া লাল হয়ে বলেছিল, 'বা-জানকে ওভাবে বলছো কেন?'

সুলতান আলীর স্বর ভেঙ্গে পড়ে, 'খোদা তোমার মঙ্গল করুন। তোমরা কবে আসছো?'

'ঠিক নাই।'

'সময় করে এসো। আমি তোমাদের নামে একখণ্ড জমি লিখে দেবো!'

'সুলতান আলীর কথা শুনে আমি অট্টহাসি হেসে উঠি।

রাবেয়ার বা হাতখানা আরো জোরে চেপে ধরি। ওর নরম মাংসল হাতে যেন রক্ত জমে যায়। তখন আমার দীর্ঘ দিনের অভুক্ত শরীরের কী প্রচণ্ড লালসা। সুন্দরী রাবেয়ার সবচেয়ে চরম, সবচেয়ে গোপন, সবচেয়ে কুৎসিৎ নাক সর্বস্ব গহ্বরে ডুব দেবার বাসনায় তখন আমি উন্মাদ।...'

'...রাবেয়া আমার কেবিনে ঢুকে কাঁদছিল। সুখ ও দুঃখের যুগপৎ অভিপ্রকাশ। আমি আমার দাস্তানা খুলে বালিশের ভিতর রাখি, রাবেয়ার কপালে চুমু খেয়ে কেবিনের বাইরে এসে দাড়াই। আমার সহকর্মীরা কিন্তু উৎসব করছে। ওয়াচের ঘণ্টা পড়লেও কেউ আর চট করে ডিউটিতে যেতে রাজি নয়। সুকানী জাহাজের দেওয়ালে মঙ্গলসূচক নক্ষত্রের চিহ্ন আঁকছে। রাতে ঐ চিহ্নগুলি থেকে সত্যই নক্ষত্রের আলো বিচ্ছুরিত হবে।'

আমি তখন ইতি উতি কেবল শিবপ্রধানকে খুঁজছি। বেচারির ওপর কাল আমি অনেক রূঢ় ব্যবহার করেছি। অথচ, ও না থাকলে এই সাদা রং কেবিন চিরটাকালই শূন্যতা সৃষ্টি করতো।

বার কয়েক হাঁকাহাকি ডাকাডাকিও করলুম প্রধান প্রধান বলে।

ষ্টুয়ার্ড এসে খবর দিল, 'প্রধান প্রচুর মাল টেনে চিমনির গায়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে।'

শুনে আমি হেসে উঠি—প্রধানটাতো এমন বেহেড মাতাল ছিল না, ইদানীং ওর মদ্যাশক্তি কয়েকগুণ বেড়েছে।

প্রধানের খবরে আমার হাসি পেলেও রাবেয়া কিন্তু চমকে ওঠে।

রাবেয়ার কচি আঙুরের স্তবকের মতন চিবুকে ঐ চমক আরো আমি দু'বার লক্ষ্য করেছি। প্রথমবার সে পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল সুদেহী ষ্টুয়ার্ড ভৈরব ফনীর দিকে; দ্বিতীয়বার বিস্ময়ে সে কেঁপে উঠেছিল কেবিনে ঝুলন্ত বটুয়াটার দিকে চেয়ে।

আমি কি তখন জানি, নীল জলে সরু সরু স্কীপ বাঁধার মতন

আমার ভবিতব্যও ঝুলছে ঐ তিনজনের ওপর,—শিবপ্রধান, ভৈরব-ফনী ও দেয়ালে ঝুলন্ত চক্‌চকে বটুয়া।

উৎসবের রাতে জাহাজীরা সকলে এমন পোশাকে আশাকে মাঞ্জা দিল যেন তারা বিলাসী ডাকসাইটে বাবুদের মতন ময়দানে কুকুরের দৌড় দেখতে যাচ্ছে। কাল রাতভর বৃষ্টির জন্য আজও সমুদ্রের বুকে ঠাণ্ডার দাপট কম নয়। গোটা জেটিটাকেই বাতাস সময় সময় প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমার মাথায় ফেল্টক্যাপ, আমার হাতে কর্ক ও পেনার এবং আমার টেবিলে একপেটি টাটকা মাল —আজ আমি আমার এই ছোট্ট কেবিনেই সকলকে আকণ্ঠ পানের আমন্ত্রন জানিয়েছি। কচি টিউলিপ-ফুলের চারা গাছের মতন সাজিয়ে গুছিয়ে বসিয়ে রেখেছি রাবেয়াকে —অধস্তনরা একে একে তাকে সেলাম জানিয়ে যাবে।

সকলেই এসেছে।

আসেনি শুধু শিবপ্রধান।

এবারেও খবর দিল সেই ষ্টুয়ার্ড, শিবপ্রধান নাকি তখনো বেঁহুশ।

আমি আবার হেসে উঠি।

আবার অস্বস্তি বোধ করে রাবেয়া।

'তারপরদিনও শিবপ্রধানকে আমি আমাদের খাবার টেবিলে আনতে পারি নি। অদ্ভুত স্বরে সে আমাকে জানায়, ক্যাপ্টেন দম্পতির কাছে আসতে তার এখন নাকি গভীর লজ্জা হয়! এতদিন যেমন-তেমন ছিল, এখন থেকে সে তার ক্যাপ্টেনকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে চলবে।

রাবেয়ার উরুতে ছোট্ট থাবা বসিয়ে কথাটা আমি রীলে করি। আমার পৌরুষ তৃপ্ত হয়। কিন্তু শুনে রাবেয়ার আবার সেই অস্বস্তি। সে যেন ভয় পেয়েছে। কেন বুঝি না।

*   *

*

ইস্টার্ন আইল্যাণ্ড ছেড়ে আবার কোকো দ্বীপ। কোকো দ্বীপ থেকে পোর্টব্লেয়ার। চক্রবৎ ঘুরছে ট্যাগ 'মহল'। জাহাজীদের রেঁস্তরা থেকে সস্তায় প্রচুর পরিমানে গোস্ত আনা হলো। কখনো মাটিতে, কখনো জলে—জাহাজীদের জীবনে এখন বৈচিত্র্যের অভাব নাই; কেউ বলতে পারবে না, সে দুঃসময় নৈরাশ্যে ভুগছে। অন্ততঃ প্রত্যেকেরই মুখের রং চকচকে। ব্যতিক্রম কেবল একজন—সারেং শিবপ্রধান। কয়েক মাস আগেও যে লোকটা তার পূর্বপুরুষের রক্তের ধারা অনুযায়ী কাজের নেতৃত্ব দিতে ছুটে আসতো, এখন স্বেচ্ছায় একা, গভীর নিঃসঙ্গতা তাকে জড়িয়ে ধরে আছে।...

পোর্টব্লেয়ারে জাহাজ জেটিবদ্ধ হলেও ক্যাপ্টেন তাঁর কেবিন ছেড়ে মাটিতে পা রাখতে গররাজি। এমন কি তিনি কদাচিৎ ডেকে রেলিঙে ভর করে দাঁড়ান ও নীলরঙের সমুদ্র—আকাশকে দেখেন।

তাঁর নতুন সুনিপুন সাংসারিক জীবন শুধু ঐ কেবিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একমূহূর্তও তিনি সুন্দরী রাবেয়ার সঙ্গ ছেড়ে যেতে রাজি নন।...

একটা তাজা গোলাপের মতন ক্যাপ্টেনের বুকে লেপ্টে আছে রাবেয়া। ওর কাজলটানা দুই চোখের আবেদন রক্তে পাগলামির বীজ ছড়ায়। সময় সময় মুখের ভাব এমন করে যেন পুতুল নাচের নায়িকা। এমন দুষ্টুমিভরা খিল খিল হাসি হাসে যে গোপন বিশ্বাসভঙ্গের ভয় বুকের ভেতর ছ্যাং ক'রে ওঠে। আবার কখনো চোখ ছল ছল করে, অভিমানে তার মুখ হয় বিবর্ণ।...

তখন মাত্র সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। ক্যাপ্টেন বাংকের ওপর রাবেয়াকে জাপটে ধরে আছেন। পুরুষ অশ্ব যখন কামুক হয়, তখন হয়তো তাকে এরকমই দেখায়। নিজের দায়-দারিত্ব মাথায় উঠেছে, মায় জেটিবদ্ধ জাহাজের এঞ্জিন রুমে নেমে যাবার দরজাতেও

তালা লাগাতে ভুলে যান, কদাচিৎ অ্যাকোমডেশান ল্যাডার ধরে ছাদে উঠে চোখে দুরবিন লাগান, অ্যালওয়ের অন্ধকারে দাড়িয়ে বিষণ্ণ সারেং কি করছে, তাঁর নজরে আসে না। এখন তাঁর শরীরে-মনে একজনেরই ছায়া-কায়া—রাবেয়া, রাবেয়া, রাবেয়া···!

এক এক রাতে একাধিকবার সহবাসেও ক্লান্তি আসে না। এইকালে পুরুষের এমত নির্বোধ অন্ধ আবেগ দেখলে যুবতী মাত্রই পুলকে ও কৌতুকে স্বয়ং সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠে অথবা, সে তখন বশীভূত দৈত্যকে দিয়ে নিজের সাম্রাজ্য গড়তে থাকে।

বুকের ঢাকনা সন্তর্পণে খুলতে খুলতে রাবেয়া আশ্লেষে বলে, 'তুমি একটা আস্ত হাতী।'

'তুমি তবে হাতীর চেয়েও বড়।'

'কেন?'

'এই গোটা হাতীটাকেই গিলে খাচ্ছো বলে।'

'আমি তবে হাতী ধরার ফাঁদ বলো। উপর থেকে বোঝা যায় না, গভীরতা কতখানি!'

সমস্বরে হো-হো খিল-খিল হাসি।

পোর্টব্লেয়ারে তখন ট্যাগটার প্রারম্ভিক মেরামতি চলেছে। না, ঠিক মেরামতি নয়, 'মহল'-এর জেল্লা বাড়ানো হচ্ছে। অতি উৎসাহী খালাসীদের বেশীর ভাগই পারে অথবা, বারে ঢুকে হল্লা জমিয়েছে। সীমাহীন নোনা জল দেখার পর ধূসর ও সবুজ পটভূমি কত মুগ্ধকর। আশে-পাশের প্রবাল দ্বীপগুলিও বড় নিষ্ঠুর, কারণ ওখানে প্রাণের সন্ধান বড় একটা পাওয়া যায় না। আর কাঁহাতক দেয়ালে উলঙ্গ নারীর ছবি দেখে রমনীদেহের স্বাদ অনুভব করা যায়।···তবু জাহাজীদের কেউ কেউ তাদের আবাস 'মহল' কে খুব ভালোবাসে, এর জেল্লা বাড়াতে তাদের প্রয়াসের অন্ত নাই। অনেক চেষ্টায়

ঈষৎ চাকচিক্যও লক্ষনীয়। চিমনির গায়ে খার বস্তু ঘষে ঘষে ময়লা দাগ তোলা হচ্ছে, কোলবয় স্মোক্‌বকস্‌ পরিষ্কার করতে গলদঘর্ম… সন্ধ্যা ঘনাতে ব্যালেষ্ট পাম্পের চারপাশে শক্তিশালী টর্চ মেরে কোন দুর্বল স্থান আছে কি না, আবিষ্কার করছে সারেং শিবপ্রধান, ডেক-জাহাজীরা গাম-বুট পরে জল মারছে তো মারছেই।

কেবিন ও কেচিনের মধ্যবর্তী কপাটটা বন্ধ।

সাত সন্ধ্যাতেই গোলাম মহম্মদের প্রেমও সোহাগ উথলে ওঠে। অথচ, কপাটের ওপাশে যদি কেউ কান পাতে, এ ঘরের প্রতিটি শব্দ ও উচ্চারণ শোনা তার পক্ষে অসম্ভব হবে না। কিচেন অবশ্য অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার। কিছুই দৃষ্টি গোচর হবার নয়। অথচ, সেখানে চাপা নিঃশ্বাসের অস্তিত্ব আছে বৈ কি! কপাটের গায়ে লেপ্টে আছে কার দীর্ঘ-পাথর শরীর। হিমেল নিরেট 'মহল' এ উত্তেজনার আগুন ছড়াচ্ছেন ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ ও তাঁর সোহাগিনী রাবেয়া।…

যথারীতি ক্যাপ্টেনের বক্ষ লগ্ন রাবেয়া। ওর ঈষৎ সোনালী চুলে মুখ গুঁজে ক্যাপ্টেন ডাকেন, 'রাবেয়া।'

'উঁ।'

'কেমন লাগছে?'

'সুন্দর।'

'আমার এই জাহাজখানা কেমন?'

'তুলনা হয় না।'

'আর জাহাজীরা?'

'সকলেই ভালো। তবে—'

'তবে কি?'

'আমার একজনকে দেখে বড় ভয় হয়।'

'ভয়! কাকে?'

রাবেয়ার দৃষ্টি কেবিনময় এমন ঘুরতে থাকে, যেন সে তার ভয়ের লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আবার বলেন, 'কাকে ভয় ?'

'তোমার সারেংকে।'

'সারেং! মানে শিবপ্রধান।'

'হুঁ, শিবপ্রধান।'

রাবেয়ার কথা শুনে বারেকের জন্য থমকান গোলাম মহম্মদ। একটা শুকনো ধূসর পাতা যেন উড়ে বেড়াতে থাকে তাঁর দুই চোখে।

রাবেয়া ঢোঁক গিলে বলে, 'মেয়েমানুষের চোখ ভুল করে না। ওর লোভ আছে আমার ওপর।'

গোলাম মহম্মদ চমকালেন। কিন্তু পরমুহূর্তে তিনি যেন দেখতে পেলেন, একটা পোষা ভালুকের মতন নির্বিরোধ শিবপ্রধান তাঁকে বার বার আদাব জানাচ্ছে। ঐ ভালুকের ভেতর এতখানি লোভ, উচ্চাশা জেগে থাকা সম্ভব নয়।

গোলাম মহম্মদ এবার হি-হি করে হেসে উঠলেন। ওঁর এই হাসির শব্দটাকে অশ্লীল মনে হয়। এই হাসি যখন কেউ হাসে, মহিলারা তার ভেতর বিহ্বল পাশবিকতার সন্ধান পায়। রাবেয়াও বিরক্ত হচ্ছে, অপ্রতিভ হচ্ছে।

হাসতে হাসতে বিছানা থেকে নেমে ক্যাপ্টেন পোর্টহোলের কাঁচটা তুলে দিলেন। তখনই ঝলকে ঝলকে সামুদ্রিক বাতাস তাঁর মুখে ঝাপটা মারে। জলের ওপর এই ট্যাগেরই ছায়া তিরতিরিয়ে কাঁপে। অনেক দূরে আকাশের কোন চিরে বিদ্যুতের চমক। সম্ভবত এ বছর বর্ষা এসে গেল অনেক আগেই। বর্ষায় যাত্রী সংখ্যা কম হয়। জাহাজীদের হাড়িয়া হাপিজ নিয়ে দাপাদাপি বেড়ে যায়।···জেটির লকগেটের দিকেই দৃষ্টি রেখে ক্যাপ্টেন আর এক দমক হাসলেন। কি মজাদার বাৎ বলছে রাবেয়া। পুওর

শিবপ্রধান নাকি ক্যাপ্টেনের বিবির ওপর নেক্ নজর দিয়েছে। এ কী কখনো সম্ভব!

ক্যাপ্টেনের ঐ বেখাপ্পা হাসিতে বিরক্ত হয়েছিল রাবেয়া। সে তার স্বাভাবিক ক্ষমতায় মানুষের চোখ চেনে। চোখের মাধ্যমে মনের ভাষা পড়তে পারে। দিলখোলা মানুষ গোলাম মহম্মদ আর কি করে বুঝবেন, আপত নিরীহ নির্বিরোধ মানুষের মনেও বিষাক্ত নীল মাকড়সারা ঘুরে বেড়াতে পারে।

ক্যাপ্টেন অবশ্য একটু বাদেই বিছানায় ফিরে এসে রাবেয়ার ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, সোহাগের স্বরেই বলেছিলেন, 'আশ্চর্যের নয়। তুমি যে সেরা সুন্দরী—লাখো মে এক!···তবে হ্যাঁ, যদি ও হতভাগা কখনো বিরক্ত করতে আসে, তুমি ওকে শুধু ভয় দেখাবে—আমি ক্যাপ্টেনকে বলে দেবো। ব্যস্, তা হলেই প্রধান আর জীবনে তোমার মুখোমুখি হবে না।'

একটা ঢেকুর তুললেন গোলাম মহম্মদ; এমন একটা শব্দও তুললেন গলার ভেতর থেকে, যেন এক নিমেষে এই সমস্যার তিনি সমাধান করে ফেলেছেন।

কিন্তু রাবেয়া নিশ্চিন্ত হতে পারে না, সে কোমর পর্যন্ত কাপড়টা টেনে নেয় এবং হাত দুটো অনাবৃত বুকের ওপর রাখে, স্থির চোখে বিবর্ণ গলায় বলে, 'তার চেয়ে তুমি বরং ওকে বরখাস্ত করো।'

মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের নোনাজল চিহ্নিত মুখে দায়িত্বজ্ঞানের ছাপ পড়ে, 'এটা কি বলছো ডার্লিং। শিবপ্রধান আমার জাহাজের একটা এ্যাসেট্, জানো? আমার চেয়েও ও সমুদ্রকে ভালো চেনে। আই এ্যাডমিট হিজ রেয়ার কোয়ালিটি!'

অতঃপর ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব ক্যাপ্টেন করছেন। দিন কয়েক

রাবেয়াকে নিয়ে মত্ত থাকবার পর আবার একটু একটু করে স্বস্থানে তিনি সম্রাটের ভূমিকা পালন করতে লাগলেন।...

কিন্তু রাবেয়ার ভূমিকা বিচিত্র, ভিন্নতর। ক্যাপ্টেনের ঐ অদ্ভুত অস্ত্র বটুয়াতেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের রূপ, যৌবন-ঐশ্বর্য দেখেন। কেবিনের কপাট বন্ধ করে রাবেয়া নিজেই নিজের কোমল ত্বকের বাহার দেখে। মুরগীর নরম কলজের মতন তার বুক, দেখলে যে কোন অতি চালাক ও অভিজ্ঞ মানুষেরও তোতলামি এসে যেতে পারে। সোনালী চুল বালিশের ওপর বিছিয়ে, ঈষৎ নীলাভ চোখ দুটি ওপরের দিকে তুলে নিরাভরণ হয় রাবেয়া!

এবং ঠিক সেই সময়ই কিচেনের একটা পাল্লা ধরে উঁকি মারে এক জোড়া চোখ।

শরীর হননে উদগ্র লালসাভরা দৃষ্টি।

ঐ দৃষ্টি কার?

সত্যি কি রাবেয়া খেয়াল করছে না ঐ একজোড়া চোখকে? অথবা—

'মহল' তো জাহাজ নয়। প্রকৃত জাহাজের মতন সে দূরযাত্রী নয়। আন্দামানের মাত্র কয়েকটা দ্বীপে তার নির্দিষ্ট আনা গোনা। গোলাম মহম্মদ রাবেয়াকে দুনিয়া দেখাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। দুনিয়াটা কি এতো ছোট? রাবেয়া কিন্তু তাঁকে অনেক দিয়েছে, অনেক সুখ। শত কাজের মধ্যেও সেই সুখের স্বাদটুকু অনুভব করেন গোলাম মহম্মদ। চেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে ঘনিষ্ঠ জাহাজীদের কাছে রাবেয়ার গুনগান করেন।

'...তোমাদের ক্যাপ্টেনের বিবি কিন্তু সাধারণ মেয়ে নয়। ও গাছপালার ভাষা বোঝে। এখন সমুদ্রকেও চিনতে শিখেছে। কাল যখন আমরা প্রবাল দ্বীপটা পার হচ্ছিলাম, ও জলের দিকে তাকিয়েই বলে দিল, এখানে মাছের ঝাঁক চলাফেরা করছে। আর

সত্যি ওখানে আমাদের জালে তখন এক গণ্ডা বড় বড় ভোলামাছ বেঁধেছে।... আর কাল তোমাদের ক্যাপ্টেনের বিবি নিজের হাতে মাছ রেঁধেছিল। মানে ষ্টুয়ার্ড ভৈরবকে দেখাচ্ছিলো। কি ভাবে ঐ মাছ পাকাতে হয়। ভৈরব এখন নতুন ক'রে ওর কাছে রান্নার তালিম নিচ্ছে। রাবেয়া এখন সবচেয়ে খাতির পায় ভৈরবের কাছ থেকে।...'

ইস্তক কথা বার্তায় জাহাজীদের মুখে খুশীর আলো। কিন্তু প্রধানের দুই চোখে এসে বাসা বেঁধেছে হিংস্র হায়না। খোদ ক্যাপ্টেনও আজকাল ওর অন্যমনস্কতা লক্ষ করছে। নিজের কাজ ঠিকই করছে প্রধান, কিন্তু কথা বলে খুব কম। সম্প্রতি কেউ তাকে হাসতে দেখেনি। তারপর একদিন ট্রপিকস্ প্রবাল দ্বীপের সামনেই ঘটলো সেই মারাত্মক ঘটনাটা।

ট্রপিকস্ প্রবাল দ্বীপে মানুষের কোন স্থায়ী বসতি নাই। শুধু ওখানকার নারকেল বন লিজ নিয়েছে গোলাম মহম্মদেরই এক পরিচিত লোক। প্রতি শনিবার গোলাম মহম্মদ তাঁর ট্যাগে ঐ ব্যবসায়ীর মাল বয়ে নিয়ে যায় পোর্টব্লেয়ারের উদ্দেশ্যে। লোকটা শুধু জাহাজ ভাড়াই দেয় না, গোলাম মহম্মদকে খুশি করবার জন্য এক বোতল ক'রে বিলেতি মদও ভেট দেয়। ও বস্তু এখানে মাগ্‌গি নয়। আর মহম্মদের সুরাসক্তি প্রবাদের মতন।...

প্রবাল দ্বীপে জাহাজের নোঙর পাতবার জন্য কোন জেটি নাই। তাই দ্বীপটা কাছাকাছি আসতেই তিনি হাঁক দিলেন : হল্ট!

থর থরিয়ে কেঁপে উঠে নিশ্চল হয় মহল!

শরিৎ ভূষণ এগিয়ে এসে বলে, 'আজ কে যাবে ঐ দ্বীপে?'

ক্যাপ্টেনের চোখে কৌতুক নাচে, 'বলতো, কে?'

শরিৎ ভূষণ হাসে, 'বোধহয় আমি ও প্রধান। মাল তো ওরা দিয়ে যাবেই। তা ছাড়া আজ দুটো টাটকা বোতল দেবে বলেছিল।'

ক্যাপ্টেন পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়েন, 'শুধু বোতল নয়।

আমার বায়না মতো ক'লকাতা থেকে একটা হালফ্যাশান গাউনও এনে দেবার কথা আছে রাবেয়ার জন্য।'

শরিৎ ভূষণের হাসি আরো বিস্তারিত হয়, 'তা হলে স্যর আজ আপনার যাওয়া উচিত্।'

'আমিই যাবো, বলছো?'

'আজ আপনিই যান। ওখানকার কত্তা খুব খুশী হবেন।'

'তবে তাই হোক।'

—পেটে হাত বোলাতে বোলাতে ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ান।

'মহল'-এর সবেধন নীলমণি যে ধূসর রঙের বোটখানা, হুঁক খুলে তাই নামানো হলো জলে।

ক্যাপ্টেন বোটে উঠবার পূর্বমুহূর্তে দেখতে পেলেন, রাবেয়া ডেকের রেলিঙ ধরে এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। বাতাসে উড়ছে তার শাদা ওড়না, এপাশ ওপাশ করছে সোনালী চুল।

ক্যাপ্টেন হাত তুললেন। রাবেয়াও হাত নাড়ায়। হঠাৎ কি মনে হতেই খালাসী আজমকে জিজ্ঞেস করেন গোলাম মহম্মদ, 'প্রধান কোথায়?'

আজম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, 'আবার সে স্যর স্পিরিট গিলে মাতলামি করছে।'

ক্যাপ্টেনের ভ্রূ কুঁচকে যায়, 'মাতলামি!'

'হাঁ স্যর, এঞ্জিন রুমে ঢুকে সুকানীকে একচোট খিস্তি দিলে।'

ক্যাপ্টেন বিরক্ত ও গম্ভীর গলায় বলেন, 'প্রধানটা খুব বাড়াবাড়ি করছে। ফিরে এসে আজ আচ্ছা করে 'ডেটে দেবো!'

চিন্তান্বিত ক্যাপ্টেন বোটে উঠে বসেন। স্বয়ং দাঁড় ধরেন। সামনে-পিছনে অপার্থিব দৃশ্য। সীমাহীন নীল সমুদ্রে চারিদিকে মালার মতন ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে প্রবালদ্বীপ। দ্বীপে সবুজ বন, এতদূরেও যেন ভেসে আসছে বনজ গন্ধ। গোলাম মহম্মদ

যেন ডেইজী ফুলের গন্ধ পেলেন। এই স্বয়ং দাঁড় বেয়ে দ্বীপে পৌঁছানো—এ বড় সুখকর ও রোমাঞ্চকর অনুভূতি। ক্যাপ্টেন এক স্বপ্নিল আবেগে তাঁর বিগত জীবনের দুটি-একটি স্মৃতিকে স্মরণ করেন।…

ক্যাপ্টেন মাত্র কয়েক দাঁড় এগিয়েছেন, হঠাৎ এক তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদে গোলাম মহম্মদ চমকে ওঠেন। মুখ ঘুরিয়ে যা দেখলেন, তাতে তাঁর সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মাথায় তেড়ে আসে। দেখলেন, মাতাল প্রধান জাপটে ধরেছে রাবেয়াকে এবং দু'-তিনজন জাহাজী আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রধানকে সরিয়ে আনতে।

ঐ ভয়ানক অথচ, কৌতুহলোদ্দীপক দৃশ্যে ক্যাপ্টেনের শরীর টলে। কিন্তু তাঁর সেই বিহ্বলতা সাময়িক। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় বোটের মুখ ঘুরিয়ে নেন ক্যাপ্টেন। চিৎকার করে বলেন, 'উজবুকটাকে ধরে রাখো আজম, আমি ওর জান খিচে নেবো!…'

সাঁ সাঁ করে বোট এসে লাগে ট্যাগের গায়ে।

সিঁড়ি বেয়ে এক রকম ছুটে এসেছেন গোলাম মহম্মদ!

ততক্ষণে প্রধানকে কব্জা করে ফেলেছে আজম।

রাবেয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়েছে কেবিনে।

গোলাম মহম্মদ কয়েক পলক দাড়িয়ে লক্ষ্য করলেন প্রধানকে। ব্যর্থ ছোবলের পর সাপের যা দশা হয়, প্রধানের তাই হয়েছে। দুই ঠোঁটের কোন বেয়ে সমানে ফেনা গড়াচ্ছে। গলা ঠেলে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ। তার চতুষ্কোণ বিশাল পিঠ পাহাড়ের মতন কেঁপে কেঁপে উঠছে, রেলিঙটাকে তখনো শক্ত করে চেপে ধরে আছে এবং শিরাবহুল শরীরের সামগ্রিক অভিব্যক্তিতে কাম ও হিংস্রতা।

ক্যাপ্টেন কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রধানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন না। ভারী পায়ে গিয়ে ঢুকলেন কেবিনে। দেখলেন, রাবেয়া তখনো দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। কিছুক্ষণ বিমূঢ়-নিশ্চল হয়ে থাকেন গোলাম মহম্মদ।

তারপর হঠাৎই তাঁর চোখের সামনে ঝলসে ওঠে সেই বরাভয়-অস্ত্র—বটুয়া। বাঘের মতন লাফিয়ে ক্যাপ্টেন সেই অস্ত্রটা পেড়ে ফেলতেই রাবেয়া আর্তগলায় জিজ্ঞেস করে, 'কি করছো?'

'করছো নয়, করবো। আমি ঐ শয়তানটাকে খতম করবো। মাতলামির আর সীমা নাই!'

রাবেয়া ছুটে এসে গোলাম মহম্মদের পথ আগলে দাঁড়ায়। গোলাম মহম্মদ সঙ্গে সঙ্গে কিচেন দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিচেনের দরজা খুলতেই বিশালদেহী ভৈরব ফণীর সঙ্গে মুখোমুখি।

ফণী বলে, 'স্যর, আমাকে ওটা দিন—আমি প্রধানকে খুন করবো!'

ক্যাপ্টেন ওর মুখের দিকে বারেকের জন্য তাকালেন মাত্র। তারপর ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শিবপ্রধানের ওপর।…

বটুয়ার ধারালো দিকটা নয়, গোলাকার বাটির মতন দিকটাই ব্যবহার করলেন গোলাম মহম্মদ। সজোরে মারলেন শিবপ্রধানের মাথায়। এক আঘাতেই কাৎ-হ'য়ে পড়লো প্রধান। বেশ খানিকটা রক্ত ছিটকে এসে লাগলো ক্যাপ্টেনের গায়ে।…

১০

....

[গোলাম মহম্মদের স্বরভঙ্গ/মন্ত্র বড় ভয়ানক।]

একটানা বলে যাবার পর আমার খেয়াল হলো, গোলাম মহম্মদের স্বরভঙ্গ ঘটেছে। অথচ, আমরা গল্পের এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে বাকিটা না শুনে পারি না। বরং, মহম্মদ থামলে আমি তো উসখুস করতে শুরু করি। চক্রবর্তী হয়তো এই গল্পের সবটাই জানে। আমার কাছে নতুন এবং প্রায় অভিনব। রাত এখন ঢালুতে গড়িয়ে পড়েছে। আশঙ্কা হয়, যে কোন সময়ে পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ আকার নিতে পারে। আর আকাশ যদি আলোময় হয়ে ওঠে, গোলাম মহম্মদের এই গল্পও তার প্রভাব ও তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে।...

.

মহম্মদ একবার উঠলেন। অ্যালওয়ের বন্ধ দরজাটা টেনে দেখলেন। মুখ উঁচু ক'রে মাস্তুলের দিকে চাইলেন। এঞ্জিন-রুমের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি তাঁকে। তারপর ফিরে আসেন, অত্যধিক পান করায় গতি তাঁর শ্লথ।

আমার মাথার ভেতরে ঝিম ঝিমানি। আমি হয়তো আগামী আরো কয়েক রাত ঘুমোতে পারবো না।...ডেকের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে ঘুমন্ত জাহাজীরা। হয়তো ওদের অনেকেই এই গল্পের পার্শ্বচরিত্র, কিন্তু তারা গোলাম মহম্মদের মুখে এই গল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপ শুনছে না।:...

আমরা তিন জনেই হেলান দিয়ে বসে আছি। উঠে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ যে পায়চারি করবো, সে শক্তিও নাই। শরীরের ওজন

ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে, বিশেষতঃ মাথাটাকে সোজা রাখাই একটা সমস্যা ; হাত-পাগুলি যেন আলাদা আলাদা, এই দেহের সঙ্গে যেন ওদের কোন যোগ নাই ; নিবিড় মদিরতায় আমার মনে হয়, শরীরে যেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।···

স্বরভঙ্গ ক্যাপ্টেন কপালে হাত রেখে আবার বলতে শুরু করেন।—

'···এই ছিল তার শাস্তি। জাহাজীর গায়ে হাত দেওয়া আগেকার দিনের ক্যাপ্টেনদের রেওয়াজ ছিল। সামান্য পান থেকে চুন খসলেই শুরু হতো 'ফ্লাগিং'। চাবুক মেরে জাহাজীর পিঠের চামড়া খুলে নেওয়া হতো। ফলে এর একটা প্রতিক্রিয়াও ছিল। বহু জাহাজের ক্যাপ্টেনেরই নিয়তি ছিল ঐ সব অত্যাচারিত জাহাজীরা।···

আমি কিন্তু কখনো কোন জাহাজীর গায়ে হাত তুলিনি। সেই প্রথম ও সেই শেষ। বটুয়ার এক ঘায়ে প্রধানের খুলিতে চিড় খেয়ে গেল। টলে পাটাতনে আছড়ে পড়েছিল সে। রক্তে ভিজে যাচ্ছিলো ডেকটা। কয়েকজন জাহাজী ছুটে এসে ওকে তুলে নেয়।

আমি ওদের বললাম, 'ওর মাথাটা ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করে দিও। বেশী রক্তপাত যেন না হয়। যতটুকু বদরক্ত ছিল, বের করে দিলাম।'

কেবিনে ফিরে আসতেই রাবেয়া আমাকে জাপটে ধরে। ও আমাকে এতজোরে চেপে ধরেছিল যে কিছুতেই আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলুম না। ক্রমশঃ বুঝতে পারি, রাবেয়া আমাকে বিছানার দিকে টানছে। অথচ, কেবিনের দরজাটা খোলা। আমি কিছু একটা বলতে চাই, কিন্তু রাবেয়া আমাকে বলতে দেবেনা —হাত দিয়ে আমার মুখ চাপা দেয়।

আমার হাত থেকে বটুয়াটা খসে পড়ে মেঝেতে। একটা ঝন্ ঝনে আওয়াজ যেন ব্যর্থ প্রতিবাদ জানায়।···

'...মাত্র দু'দিন পরে আবার নিজের কাজে বহাল হলো শিব প্রধান। আমি ওকে বরখাস্ত করতে পারি নি। মনে মনে যুক্তি খাড়া করেছি, শিবপ্রধান নেশার ঘোরে ঐ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থাতে মানুষ তো স্বাভাবিক থাকে না। তা ছাড়া আমি ওর রক্তপাত ঘটিয়েছি। রাবেয়া যতই বলুক, আমি আমাব দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গীর প্রতি আর নির্দয় হতে পারি না। বরং প্রধানের জন্য আমার বুক মমতায় ভরে যায়। শেষ পর্যন্ত একদিন আমি নিজেই গেলুম ওর সঙ্গে সহৃদয় আলাপ কবতে।...'

ছুটন্ত জাহাজের ঘ্রাণ সবত্র। ক্লান্ত, প্রায় প্রৌঢ় ক্যাপ্টেন কেবিন থেকে বেরিয়ে এঞ্জিন-রুমের দিকে চললেন। এঞ্জিন-রুমে বয়লারের কাছাকাছিই টুলের ওপর শিবপ্রধান স্থানুর মত বসে আছে। এখনো ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজ। কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে। আরো শীর্ণ, আরো বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে। চোখ দুটো যেন জমাট বরফের মতন পিছিল, অথচ কঠিন। ঠোঁটের কোনে সিগ্রেট। কোন জাহাজীর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করে না। এঞ্জিনের ওঠা-নামা, ঝক্-ঝক্-ঝক্ শব্দ, বয়লারের রক্তচক্ষু—সবই কেমন মুহ্যমান। সমুদ্রে বাতাস নাই। বর্ষার মরশুম আবার বুঝি পিছিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন ডাকেন, 'প্রধান।'

শিবপ্রধান চমকে ওঠে। হাতের সিগ্রেটটা চকিতে ফেলে দিয়ে গাম-বুটে চেপে দেয়।

ক্যাপ্টেন হাসেন, 'চলো প্রধান, ডেকে যেয়ে দাঁড়াই।'

সে নিঃশব্দে উঠে আসে। ক্যাপ্টেনের পিছন পিছন গ্যালীতে এসে দাঁড়ায়।

ক্যাপ্টেন ওর কাঁধে হাত রাখেন। প্রধানের কঠিন শরীর একটু যেন কেঁপে ওঠে।

ক্যাপ্টেন বলেন, 'তুমি আরো দু'দিন বিশ্রাম নিলে পারতে।'

প্রধানের কঠিন চোয়াল নড়ে ওঠে, 'আমি সুস্থ।'

ক্যাপ্টেন বলেন, 'আমার ওপর খুব অভিমান হয়েছে?'

প্রধান সমুদ্রের দিকে চেয়ে বলে, 'না, আমি আমার শাস্তি পেয়েছি।'

ক্যাপ্টেন বলেন, 'রেগে গেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।'

প্রধান নিশ্চুপ থাকে।

ক্যাপ্টেন বলতে থাকেন, 'দেখ, ক্যাপ্টেন হিসাবে আমি খুব কঠিন-হৃদয় নই। আগেকার দিনে বা, এখনো অধিকাংশ মার্চেন্টশিপে ক্যাপ্টেনরা যে রকম চাবুক হাতে দাপট দেখায়, আমি তো তা করি না। আমি চাবুকে বিশ্বাসী নই, আমি বন্ধুত্বে বিশ্বাসী, আমি তোমাদের সহযোগিতায় আস্থাবান।'

ঈষৎ আবেগ এসে ভর করে ক্যাপ্টেনকে। এক বুক দম নিয়ে তিনি আবার নিজের স্বরকে সংযত করেন, 'তুমি কিন্তু ভুল করেছিলে। তোমার মতন অভিজ্ঞ জাহাজীর জানা উচিত ছিল একজন ক্যাপ্টেন যখন আঘাত করে, তখন সে সর্বশক্তি দিয়েই আঘাত করে। তোমার উচিত ছিল, সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করা। তুমি যেন স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দিলে।'

—বলেই ক্যাপ্টেন হেসে উঠলেন, 'আমিই বা কি বলছি। তখন কি আর তুমি প্রকৃতস্থ ছিলে। তুমিও ছিলেনা, আমিও ছিলাম না। তুমি স্পিরিট খেয়ে মাতাল, আমি রাগে মাতাল। মাতালে-মাতালে মাঝ সমুদ্রে রক্তারক্তি।'

আপন রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠলেন গোলাম মহম্মদ। অনেকদিন পর প্রাণ খোলা হাসি হাসছেন তিনি। একবার যখন হাসতে শুরু করেন, সহজে থামেন না।

সেই উচ্চকিত হাসির শব্দে কেবিনের দরজা ঠেলে মুখ বের

করে রাবেয়া। সঙ্গে সঙ্গে কেবিন থেকেও এই দিকে উঁকি মারে স্টুয়ার্ড ভৈরব ফণী।

ক্যাপ্টেন ভাবলেন, যাবতীয় অস্বাস্থ্যকর বাষ্প উড়ে গেছে মহল থেকে। আবার সেই নির্মল পবিত্র পরিবেশ। শিঁস দিয়ে দিয়ে গান গাইতে থাকেন:

'আমি যেন জলের ঢেউ
আমার বলতে নাইরে কেউ।
চাঁদেরও হাট ভাইঙ্গা দেখি—
একুল ওকুল অন্ধকার।'

মুক্তপ্রাণ মানুষ বুটের ওপর ভর দিয়ে বাতাস কেটে নাচতেও থাকেন। সর্বত্র একটা খুশীর আমেজ। রাজহাঁসের মতন গলা উচিয়ে যেন সেই খুশির পানেই ভর ক'রে অপার নীল সমুদ্রে ভেসে চলেছে মহল। রাবেয়াকেও সেই আনন্দের ভাগ দিতে কসুর করলেন না গোলাম মহম্মদ। তার মোমের মতন মসৃণ গালে বার বার তিন বার চুমু খেলেন; একবার তো এত জোরে যে গালের একাংশে যেন রক্ত জমে যায়।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাতেই যেন বিপদের মেঘটা হঠাৎ নেমে এলো। হঠাৎ নয়; রাবেয়া প্রথম থেকেই যার আশঙ্কা করছিল, সেটাই অমোঘ কার্যকারিতায় গ্রাস করলো ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদকে।

ডেকটা সে সময় জনবিরল। কেবিন থেকে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন গোলাম মহম্মদ। পাইপটা বিস্বাদ লাগছিল। চেয়ারে বসে হাঁক দিলেন, 'আজম।'

স্মোক বকসের কাছে ছিল আজম। ক্যাপ্টেনের ডাক শুনে এক রকম ছুটে আসে।

ক্যাপ্টেন বলেন, 'রাবেয়াকে বলো, আমার বালিশের নীচ থেকে মার্কোপোলোর প্যাকেটটা দিতে।'

প্যাকেট নিয়ে আসে আজম।

সেটা হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করেন, 'প্রধান কোথায়? এঞ্জিন-রুমে?'

আজম জবাব দেয়। 'না স্যর, অনেকক্ষণ থেকে ছাদে বসে আছে।'

'কি করছে?'

'মন্ত্র পড়ছে।'

'মন্ত্র! কিসের মন্ত্র হে?'

'তা বলতে পারবো না স্যর। দুপুর থেকে আকাশের দিকে চেয়ে কি সব বলছে বিড় বিড় করে।' ক্যাপ্টেনের মুখ বিকৃত হয়, 'ননসেন্স! এত কুসংস্কার লোকটার!...'

আজম আবার এঞ্জিন-ঘরে ফিরে যায়।

প্রধানের কথা ভাবতে ভাবতে সিগ্রেটটা ঠোঁটের কোনে চেপে ধরবার চেষ্টা করেন ক্যাপ্টেন। এখন কোন বাতাসের ঝাপটা নেই, তদুপরি ধূমপানে বিশেষ আয়েশীও রপ্ত তিনি। কিন্তু কী আশ্চর্য! সিগ্রেটটা কিছুতেই তিনি ঠোঁটে চেপে রাখতে পারলেন না। ওটা গড়িয়ে পড়ে যায় নীচে। সিগ্রেটটা তুলতে গিয়ে টের পেলেন, তাঁর দুই ঠোঁট কাঁপছে। ক্রমশ আরো তাঁর মনে হয়, হাত-পা কেমন যেন শিথিল ও হিম। বুকে যন্ত্রণা নাই, অথচ শ্বাস নিতে পারছেন না। দর দর করে ঘামছেন। দৃষ্টির সামনে বিশাল নীল সমুদ্র যেন ধূসর হয়ে আসছে। অজস্র যাযাবর পাখির চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

এত দিনের পুরনো সমুদ্র-যাত্রীর আচমকা সী-ডিজিস তো হতে পারে না। বিশেষতঃ, এই লক্ষণগুলিও সমুদ্র-রোগের নয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন

ক্যাপ্টেন ; কোন রকমে রেলিঙ আকড়ে ধরে সামাল দেন। ওখান থেকেই ভাঙ্গা গলায় ডাকেন, 'রাবেয়া !'...

'...সেই আমার এক বিচিত্র অজানা রোগের শুরু। রাবেয়া নিজের বিকলতা চাপতে চাপতে আমাকে এনে বাংকে শুইয়ে দেয়। প্রথমে ভেবেছিলাম, এ বুঝি নিছক স্নায়বিক দুর্বলতা। চাঙ্গা হবার জন্য সামান্য ব্রাণ্ডি খেলাম। কিন্তু উন্নতির কোন লক্ষণ নাই। দু' চোখে ঘুম নাই, রাবেয়াকে বুকের কাছে জাপটে ধরার মতনও শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। সামান্য তন্দ্রার ভাব আসে, আর দুঃস্বপ্নের ঘোরে চিৎকার ক'রে উঠি। স্বপ্নে দেখি, কে যেন আমার মুখের ওপর একটা আয়না এনে ফেলছে এবং সেই আয়না থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আগুনের অজস্র লালা ও বেগুনী শিখা।

ভোর রাত্রে বমি হলো। সবুজ রং বমির। আর কি দুর্গন্ধ !

রাবেয়ার মুখে কিন্তু ঘৃণার লেশমাত্র নাই। সর্বক্ষণ বসে আছে আমার মাথার কাছে। অদ্ভুত স্নেহময়ী মনে হয় ওকে। একবার শুধু ওকে বলতে শুনেছিলাম, 'আয়না-বান মেরেছে তোমাকে।'

আমার তখন মনের অবস্থা এমন নয় যে, ঐ 'আয়না-বান' বস্তুটি কি, তা জানতে চাইবো। বরং, আমি মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে নিতে বলি, 'পোর্টব্লেয়ারে ফিরে ডাক্তার দাশগুপ্তকে 'কল' দিতে হবে। অন্য কোন ডাক্তারের ওপর আমার আস্থা নাই।' রাবেয়া তাৎপর্যময় গলায় মন্তব্য করে, 'আমার কোন ডাক্তারের ওপরই আস্থা নাই। আর তোমার ডাক্তারি চিকিৎসায় ভালো হবে না।'

আমি ঝাঁজের সঙ্গে বলি, 'তোমার ঐ বুনো ধারণাগুলি বদলাও।'

রাবেয়া বলে, 'রোগটা যে বুনো।'

আমার রাগ আরো চড়ে, 'অশিক্ষিতের মতন ঐ সব কথাগুলি আর আমাকে বলো না।'

রাবেয়া তবু ক্ষান্ত হয় না, 'কোন শিক্ষাকেই ছোট করে দেখতে নাই। আমি যেটা বুঝি, তুমি সেটা বোঝোনা।'

আমি আচমকা চিৎকার করে উঠি, 'শাট আপ!'

রাবেয়া চমকে ওঠে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যায়। দুই চোখ ছল ছল করতে থাকে। কিন্তু আমার কাছ থেকে সে সরে যায় না, সব সময় সে আমার মাথার কাছে পায়ের কাছে বসে। রাত্রি জাগরণে তার অমন সোনার বর্ণেও কালিমা লাগে। আমি বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীর মতন শিয়রে বালিশ দিয়ে শুয়ে আছি।

'দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন।'···সেই যে আমি উৎসাহী সক্ষম মানুষ, মাত্র তিন দিনে মড়ার মতন বিছানা আকড়ে পড়ে আছি। অতিকষ্টে এক একসময় বাংক থেকে নেমে ডেকে গিয়ে বসি। জাহাজীরা আমায় ঘিরে ধরে। পোর্টব্লেয়ারে ফিরে যেতে এখনো একদিন। আমি মৃত্যুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি।··· আমার এই অসুস্থতায় জাহাজের নেতৃত্ব নিয়েছে শিবপ্রধান। এটা আমারই সাজেশান।···'

পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছে যেতে আর বারো ঘণ্টা। পাশাপাশি বহু প্রবালদ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে অনবরত জল ভাঙছে 'মহল।' পড়ন্তি বেলার পাতলা সোনালী রং ডেকে, গলুইতে বসে মাছ ধরছে এক জাহাজী, সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে একগাদা জটলা পাকানো ফার্ণ গাছ। সারা দিনের পর ডেক, ফক্কা সব জল দিয়ে ধোয়া হবে।

ভালোই কাজ কারবার চালাচ্ছে প্রধান। অভিজ্ঞতায় পাকা-পোক্ত ক্যাপ্টেন যেন সে। যখন সে ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরিয়ে খালাসীদের বলেছিল—হাসিল হাপিজ, 'মহল' এর প্রতিটি প্রাণী চমকে উঠেছিল সেই আওয়াজে; সবচেয়ে বিচলিত বোধ করেছিল

রাবেয়া। দৃষ্টির তীব্রতা নিয়ে সে তাকিয়েছিল ক্যাপ্টেনের ক্লিষ্ট মুখের দিকে।

রাবেয়া—তোমার অসুস্থতার সুযোগে মাতব্বরি করছে প্রধান।

ক্যাপ্টেন—সুযোগ নয়, অধিকারে। আমিই সে অধিকার ওকে দিয়েছি।

রাবেয়া—অথচ, ও তোমার দুশমন।

ক্যাপ্টেন—সুস্থ মাথায় সে আমার সঙ্গে কোন দুশমনীটা করেছে? সেদিন নেশার ঘোরে ও যা করেছিল, তার শাস্তি আমি দিয়েছি। প্রধান নিজেও অনুতপ্ত।

রাবেয়া—অনুতপ্ত না, তোমার মাথা! ও যে অলক্ষ্যে বসে তোমার রক্ত শুষে নিচ্ছে, তা যদি বুঝতে!

ক্যাপ্টেন—প্লিজ রাবেয়া, আমাকে আর বিরক্ত করো না। জাহাজের প্রশাসনিক ব্যাপারে অন্তত তুমি মাথা ঘামাতে এসো না।

রাবেয়া সরে আসে।

সে ডেকের রেলিং চেপে নীচু হয়ে দাঁড়ায়। সমুদ্র শান্ত নিবিড়। দূরের এক দ্বীপে জনাকয়েক স্বল্পাবেশ পুরুষ ও রমনীকেও দেখা যায় তাদের মাথার ওপর সুপারী গাছ, গাব গাছ, নারকেল গাছ ও উষ্ণদেশীয় আরো নানা শ্রেণীর গাছ-গাছালি দৃশ্যমান।

ডেক থেকে ফিরে রাবেয়া কিন্তু কেবিনে ঢোকেনা; দরজা ঠেলে ঢোকে কিচেনে। সেখানে একজোড়া চোখ যেন তারই প্রতীক্ষায় ছিল। রাবেয়াকে দেখে সেই দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

'তুমি সমানে কয়েকদিন রাত জাগছো। চোখের কোনে কালি জমেছে…'

'…জানি। কিন্তু কি করবো, চোখের ওপর একটা মানুষ অসহায়ের মতন মারা যাবে!…'

'…তুমি কি গোলাম মহম্মদকে ভালোবাসো?'…

'...আমি বাসি না বাসি, সে তো আমায় বাসে।...'

'...সে ঠিক, কিন্তু ক্যাপ্টেন তো তোমার কথায় কান পাতছে না।...'

'...তবু আমি চেষ্টা করবো। আমি জড়োয়া উপজাতির গুনীকে নিয়ে আসবো ওকে দেখাতে।...'

'...সে তুমি যাই করো। আমার প্রতি কিন্তু নিষ্ঠুর হয়োনা...'

'...চুপ। প্রসন্ন হবার সময় এখন নয়।...'

কার সঙ্গে কথা বলছে রাবেয়া? কিচেনে তখন কে, যে রাবেয়ার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে?...ক্যাপ্টেন কিন্তু পাশের ঘরে শুয়েও সেই ফিস ফিসানি শুনতে পান নি। তিনি ধুঁকছেন। প্রতিবার শ্বাস-প্রশ্বাসে ভয় হয়, এখনই বুঝি প্রাণ-বায়ু নির্গত হবে। অসুস্থতা বাড়ছে। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে দ্রুত আয়ুক্ষয়ের পূর্বাভাষ। শরীর অদ্ভুত ক্ষীণ। নিজেকেই নিজে এখন বোধহয় চিনতে পারবেন না গোলাম মহম্মদ।...

পোর্টব্লেয়ারে ডাক্তার দাশগুপ্তকে 'কল' দেওয়া হলো। সুদর্শন ভদ্রলোক বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন ক্যাপ্টেনকে। কিন্তু রোগের কোন যথার্থ উৎস খুঁজে পেলেন না। একগাদা ভিটামিন ট্যাবলেট আর তুটো জাঁদরেল বহু বিজ্ঞাপিত আয়রণ টনিকের নাম লিখে দিলেন মাত্র।

রাবেয়ার দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখুন, ফ্রাঙ্কলি বলতে কি, ক্যাপ্টেন যে ঠিক কি রোগে ভুগছেন, ধরতে পারছিনা। মোষ্ট প্রোবাবলি, নার্ভের চাপে উনি ক্রমশই তুর্বল হয়ে পড়ছেন। আমার এ্যাডভাইস হলো, ওঁকে আপনারা লোক্যাল হস্‌পিটালে শিফট করুন। আমিও সেখানে আছি। সব সময়ে নজর রাখতে পারবো।... দেখুন চিন্তা করে।'

ডাক্তার তাঁর বিধান দিয়ে বিদায় নেন।

রাবেয়ার হাতে প্রেসক্রিপসান। আবছা অন্ধকার কেবিনে ঢুকে সে শায়িত গোলাম মহম্মদের মুখের দিকে তাকায়। গোলাম মহম্মদ নাকের কাছে থেকে থেকে হাত নাড়াচ্ছেন। রাবেয়াকে দেখেই বলে উঠলেন, 'পোকা।'

'কোথায় পোকা ?'

'এই আমার নাকের কাছে উড়ে উড়ে আসছে।'

'ও তোমার দেখার ভুল। এখানে কোন পোকা-মাকড় নাই।'

'তা হবে। আমারই দেখার ভুল।'

অবসন্ন ক্যাপ্টেন পাশ ফেরেন।

রাবেয়া তাঁর মাথায় হাত বোলাতে থাকে, কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে বলে, 'শুনছো ?'

'বলো।'

'ডাক্তার সাহেব বললেন, হাসপাতালে সীট নিতে।'

'সম্ভব নয়।'

'কেন, বলোতো ?'

'আমি তোমাকে এই জাহাজে একা রেখে যেতে পারবো না।'

'তা হলে তুমি আমার কথা ভাবো ?'

'তোমার কথা চিন্তা করেই তো আমার এই হাল।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে রাবেয়া, সেটাই ঠিক।'

ক্যাপ্টেন আবার ঘুরে তাকান, 'কি ঠিক ?'

'আমিই তোমার এই অবস্থার জন্য দায়ী।'

'ধ্যাৎ।'

'হ্যাঁ। তুমি জানো না, আমার রক্ত দূষিত। আমি তোমার জাহাজে আগুন লাগিয়েছি। আমিই এক জাহাজীকে তোমার দুশমন করেছি। আরো হয়তো অনেকেই দুশমনী শুরু করবে।'

ক্যাপ্টেন যেন অনেক কষ্টে রাবেয়ার মুখে হাত রাখেন, 'তোমার

এই ধোঁয়াটে কথাগুলি আমি বুঝি না ডার্লিং। আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

রাবেয়ার চোখে জল, 'আমিও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তবে তুমি যদি আমাকে স্বাধীনতা দাও, আমি তোমার দুশমনকে খতম করতে পারি। তুমিও এই রোগের হাত থেকে রেহাই পাবে।'

'কি স্বাধীনতা চাইছো তুমি?'

'আমি এখন যা করবো, তুমি তাতে বাধা দেবে না। প্রশ্ন করবে না।'

ক্যাপ্টেন তাঁর ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে রাবেয়ার মুখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছেন না। থর থর করে কেঁপে ওঠে তার সর্বশরীর। কোন রকমে মাথা কাৎ করেন, 'কিছু ভাবতে পারছি না। যা ভালো হয়, করো।'

'...রাবেয়াকে আমি মুক্তি দিলুম। মুক্তি এই অর্থে যে, সে যা ইচ্ছে করতে পারে। দুপুর নাগাদ কোকো দ্বীপে জাহাজ পৌঁছলে সে 'মহল' থেকে নেমে গেল। একাকী। যাবার আগে আমার কানে কানে বললো, 'ভয় নেই, আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আমি আবার আসছি।' সে আমার কপালে চুমু খেলো। আমি তার চোখের আর্দ্রতা অনুভব করি। আমারও দু'চোখ বেয়ে নোনা জল। অব্যক্ত যন্ত্রণা ও আবেগে আমি নিঃশব্দ।...একবার ইচ্ছা হয়েছিল, ডেকে দাঁড়িয়ে দেখি, রাবেয়া কোন দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সেই শক্তি যে আমার নাই। আমি মড়ার মতন নির্জিব, স্বরহীন। সুন্দরী রাবেয়া আমার কেবিন ছেড়ে, 'মহল' ছেড়ে সবুজ মাটিতে পা রাখলো। তখন খেয়াল করিনি; পরে শুনেছিলাম ষ্টুয়ার্ড ভৈরব ফণী নাকি সঙ্গী হয়েছিল তার।...

রাবেয়া যখন ফিরলো, দিনের পরমায়ূ তখন শেষ। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ক্রমশ ভয়াল। সমুদ্রের গর্জন বাড়ছে। ডেকে দাঁড়িয়ে সামান্য হল্লা করছে খালাসীরা। ক্যাপ্টেনের কেবিনে তারা বড় একটা আসে না। কিন্তু ওদের ক্ষোভ চাপা নাই। প্রধানের প্রাধান্য যেন তারা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছে না। আর প্রধান—কি কুৎসিৎ চেহারা হয়েছে তার! চিমনির কাছে ত্রিপল টাঙিয়ে সে তার আলাদা এক আবাস গড়ে তুলেছে। গুহাবাসী হিন্দু যোগিদের মতন শীর্ণ তার দেহ। দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখে হিংস্রতার রেখাগুলি স্পষ্ট। তার দুই চোখে হায়নার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। সে স্নান করে না। তার সর্বাঙ্গে দুর্গন্ধ। ঐ ত্রিপলের নীচে বসেই নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতিটি নির্দেশে যেন বারুদের আভাষ, জাহাজীরা চট্ করে অমান্য করতে সাহসী হয় না। সে আয়নায় নিজের মুখ দেখে না। কিন্তু বুঝি অপর কারুর মুখাবয়ব কল্পনা করে নির্মম সব মন্ত্র উচ্চারণ করে।···

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার গায়ে লেপ্টে ফিরে এলো রাবেয়া।

ফিরে এলো সে একা নয়। পিছন পিছন ভৈরব ফণী এবং আরো একজন অদ্ভুত দর্শন আগন্তুক।

ডেকে দাঁড়ানো জাহাজীরা অবাক হয়ে দেখে, এ আবার কাকে সঙ্গে নিয়ে এলো গোলাম মহম্মদের বিবি। উদোম বুক, বামন চেহারার জড়োয়া উপজাতির লোক। ডান হাতে একটা লাঠি, যার মাথায় রক্ত ভেজা ন্যাকড়া জড়ানো। লোকটার মুখের রেখাগুলি চারিপাশে ছড়িয়ে আছে,—সবসময়ই যেন এক টুকরো বীভৎস হাসির জাল ছড়িয়ে সে হাঁটে ও আপন মনে বিড় বিড় করে।

ভৈরব ফণী কিচেনে ঢোকে।

আর রাবেয়া সেই উপজাতিকে ডেকে এনে আঙুল তুলে দেখায় গোলাম মহম্মদকে।

গোলাম মহম্মদ প্রথমে খেয়াল করেন নি। চোখ বুজে ছিলেন। তাকাতেই দুর্বল শরীরে আঁতকে উঠলেন—'হু ইজ হি?'

রাবেয়া ঠোঁটে আঙুল রাখে, 'চুপ। উনি তোমাকে সারিয়ে তুলবেন।'

গোলাম মহম্মদ আর্তনাদ করেন, 'আমি বিশ্বাস করি না। গেট হিম আউট,...আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!' এইবার জ্বলে ওঠে রাবেয়া, 'হাঁ, তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি। রাতের পর রাত আমার ঘুম নাই কেবল তো তোমার সঙ্গেই ইয়ার্কি করবার জন্য। ভালো চাও তো চুপ করে থাকো। না হলে এখনই আমি তোমার এই জাহাজী সংসার ছেড়ে চলে যাবো।'...

ক্যাপ্টেনের ঠোঁট কাঁপতে থাকে; কিন্তু কোন স্বর গলা ঠেলে বের হয় না। রুগ্ন নশ্বর হাতে বিছানার একাংশ খামচে ধরেন।

সেই বামন বিকটদর্শন লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে গোলাম মহম্মদের দিকে। দূরে কোন জাহাজে ভেঁপু বাজে। আকস্মিক বাতাসের দাপটে পোর্টহোলের কাঁচটা ঠক্ ঠক্ করে বার দুয়েক কেঁপে ওঠে।

১১

[এ রাতটাও অলৌকিক/দুশমন খতম হলো রাবেয়ার চাতুরিতে।]

সুন্দর শোভন এ রাতটাও অলৌকিক। আমরা কেউ বর্তমানে নেই। শুধু ক্যাপ্টেন গোলাম মহম্মদ কেন, এখন তো সেই লগ্ন, যখন আমাদের তিনজনেরই বাসনা, যার যার অতীতের ভাণ্ডার উপুর করে দি।

বলতে স্বরু করলে, আবোল তাবোল আমিও কিছু বলতে পারি বৈকি! কিন্তু গোলাম মহম্মদের মতন রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা—অভাবনীয়!

শেষ রাতের চাঁদ ক্রমশ ম্রিয়মান, বিবর্ন, অতিবৃদ্ধজনের ঘোলাটে চোখের মতন। গোটা ডেক-ভূমিকে আর তেমন ঝক্ ঝকে তো মনে হয় না। অন্ধকারের কালো কালো সব বাদুররা ইতি উতি ঝুলছে। ভয়ঙ্কর নির্জনতায় বুঝি শুধু আমরা তিনজনই জীবিত।

ক্যাপ্টেনের স্বর ভেঙ্গেছে গল্পের এমন এক জায়গায়, যেখানে আমরা যেন ঐ রকমই আওয়াজ প্রত্যাশা করছিলুম। সপ্রশংস চোখে চেয়ে আছি, কখন আবার তিনি শুরু করবেন।

ইতিমধ্যে তিনি একবার কেবিন ঘুরে এসেছেন, নিরাপদ ঘুমন্ত শ্রীমতীর মুখচন্দ্রিকা দর্শন করেছেন। ফিরে এসে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলেছিলেন, 'হা করে ঘুমোচ্ছে। প্রত্যেকটা দাঁত গুনতে পারি, সোনায় বাঁধানো দাঁতটা আবার চিক চিক করছে।'

চক্রবর্তী তার থুঁতনিটা আকাশের দিকে তুলে বলে, 'আমরা কিন্তু অন্যায় করছি—তোমাকে গোটা রাতটা ওর কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছি।'

ক্যাপ্টেনের গোলাকার চেহারার ছায়াটা কিন্তু দীর্ঘ; শাল গাছের মতন দীর্ঘ উদ্ধত সুদৃঢ়।

আসলে রীতিমত স্থূলোদর, জামা তুলে নিজেই যেন মধ্যে মধ্যে থাক থাক চর্বি ও মাংস পরীক্ষা করেন। অদৃশ্য কোন আলোর রেখা তাঁর শরীরের অনাবৃত স্থানগুলিতে মাঝে-মাঝেই যেন ঝিকিয়ে ওঠে।

হু'জনের মাঝে বসে তিনি বলেন, 'শালার খুব মুটিয়ে যাচ্ছি! অথচ, সেই অজানা রোগের দাপটে আমি তখন মরা শকুন।'...

তখন অজানা ভয়ংকর রোগে গোলাম মহম্মদ প্রায় মরা শকুন, উচ্চাভিলাষী হুই চোখের স্বচ্ছতাও স্পষ্ট হয়ে গেছে; তবু তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন, রাবেয়ার ডেকে আনা বিকট দর্শন লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। তখন দূরে কোন জাহাজে ভেঁপু বাজে। আকস্মিক বাতাসের দাপটে পোর্টহোলের কাঁচটা ঠক ঠকিয়ে কেঁপে ওঠে।

ক্যাপ্টেন প্রথমে বাধা দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাবেয়ার ধমকানিতে ভারি বিমর্ষ বিমূঢ় অসহায় হয়ে এই কুসংস্কারী চিকিৎসার প্রতীক্ষা করেন।

বানরমুখো আদিবাসীটা কিন্তু তাঁকে স্পর্শও করে না। শুধু বাংকের একটা কোন চেপে ধরে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গোলাম মহম্মদের মুখের দিকে। ক্যাপ্টেনের মনে হলো, যেন হু'খণ্ড চকচকে কাঁচ তার চোখের সামনে জ্বলছে। কি হুর্বুদ্ধিতে যে রাবেয়া এটাকে ধরে আনলে! মিনিট দশেক ঠায় শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বিজাতীয় ভাষায় আদিবাসীটা রাবেয়াকে কি যেন বলে।

রাবেয়া জবাবে মাথা নাড়ে।

ক্যাপ্টেন ক্ষীণ স্বরে জানতে চান, 'কি বলছে ও?'

রাবেয়া বলে, 'আয়নার মতন চক চকে কিছু একটা বস্তু চাইছে।'

'কি হবে?'

'সেটাকে মন্ত্রপূত করবে।'

'কি লাভ?'

'ঐ আয়নায় যদি কখনো তোমার দুশমন নিজের মুখ দেখে, তবে তার সর্বনাশ হবে; আর তোমার রোগমুক্তি ঘটবে।'

'রাবিশ।'

গোলাম মহম্মদ ও রাবেয়ার কথাবার্তা কোনচাপা চোখে যেন আনুধাবনের চেষ্টা করে আদিবাসীটা। ফ্যাস্‌ফেসে গলায় আবার যেন কি জানতে চায় সে।

রাবেয়া মরীয়া গলায় বলে, 'তুমি আমাকে সেরকম কিছু দেবে কিনা বলো?'

অসুস্থ ক্যাপ্টেন একটু ভয় পেয়ে গেলেন। ইদানীং তিনি প্রায়ই আচ্ছন্নতার মধ্যে স্বপ্ন দেখেন, রাবেয়া তাঁকে ছেড়ে অনেক দূরে, বনে নয়, জনারণ্যে পালিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে; আর একদিন দেখেছিলেন, রাবেয়া স্কার্ট তুলে নাচতে নাচতে রেঁস্তরার যুবকদের খুশি করছে; পরিষ্কার রেঁস্তরাটাকে দেখেছিলেন গোলাম মহম্মদ—সেই টি-পয়, মেঝেয় বিছানো ফুল কাঁটা পুরু গালিচা, ছোট ছোট পর্দা-খাটানো কামরা, যুবক-যুবতীর সংগোপন নিরিবিলি মুখোমুখি আলাপ।...

রাবেয়ার তপ্ত মুখের দিকে চেয়ে স্বপ্নটাকে মনে করলেন গোলাম মহম্মদ। রাবেয়াকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না।

দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার অন্ধকার থেকে তিনি বলেন, 'কি যে করবে বুঝি না।...আমার বটুয়াটাকে দেখতে পারো—আয়নার মতন চকচকে।'

রাবেয়া একরকম ছুটে গিয়ে দেয়াল থেকে পেড়ে আনে

বটুয়াটাকে, হাতে তুলে দেয় আদিবাসীর। লোকটা দু'হাত মেলে ওটা ধরে থাকে, তার কৃশ মুখমণ্ডল আনন্দোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, নিষ্প্রভ দুই ঠোঁট চিরে গোটা কয়েক শব্দ মাত্র উচ্চারিত হয়।...

বটুয়াটা এক টুকরো কাপড়ে জড়িয়ে সমীহের সঙ্গে বিছানার নীচে রাখে রাবেয়া।

আদিবাসী নিঃশব্দে বিদায় নেয়। এই ঘরের আবহাওয়া কখনোই তরল নয়।

গুমোট। বুক-পিঠের ঘামে তেতে যায় বিছানা।

'পোর্টহোলের কাঁচটা সরিয়ে দাও।'

'দিচ্ছি।'

পোর্টহোলের কাঁচটা সরাতেই রাবেয়ার চোখে প্রথমেই যা ভেসে ওঠে, তা সমুদ্র নয়, আকাশে ভাসমান গোলাকার হলুদ চাঁদ। অনেকক্ষণ ধরে সেই চাঁদের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে রাবেয়া। জেটি থেকে কলকাতাগামী বিশাল জাহাজ ছাড়ছে। সেই কারণে মুহুর্মুহু ভেঁপু ও নাবিকদের সতঃসিদ্ধ অন্তরঙ্গ হৈ-হুল্লোড়।

রাবেয়া সরে এসে শায়িত ক্যাপ্টেনের পাশে জায়গা নেয়। গোলাম মহম্মদের সেই বিপুল দেহ এখন গোটা কয়েক মোটা মোটা হাড় ও ঝুল ঝুল চামড়ায় রূপান্তরিত। তাঁর হাত দুটি বারেকের জন্য শূন্যে আন্দোলিত হয় এবং একটি চাপা দীর্ঘশ্বাসের অব্যবহিত পরেই বলেন, 'কি বলে গেল তোমার গুণী?'

নিস্পৃহ নিরাসক্ত গলায় রাবেয়া বলে, 'কি আর বলবে! আমি যা ভয় পেয়েছিলাম, তাই।'

'অর্থাৎ দুশমন আমাকে মৃত্যুবান মেরেছে।'

'হাঁ, তাই তোমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন যে বিষ, কোন ডাক্তারের সাধ্যি নাই তার হাত থেকে তোমায় বাঁচায়।'

রাবেয়ার স্বরে ঈষৎ তিক্ততা। পোর্টহোল থেকে হলুদ চাঁদের ময়লা আলো দীর্ঘ বিলম্বিত রেখা ফেলেছে তার মুখের ওপর। ধূসর

ববর্ণ ক্যাপ্টেন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন, রাবেয়ার সর্বশরীর জুড়ে কি এক কাঠিন্য এসে ভর করেছে। ওর দীর্ঘ তর্জনী এসে থেকে থেকে ঠকছে ক্যাপ্টেনের ভেজা কপালের ওপর, সুপুষ্ট সুদৃঢ় বুকে ক্রমশই এক জাতের স্বৈরিনী স্পর্ধা। যদিও দুর্বল, গোলাম মহম্মদ হঠাৎ যেন অবাধ্য, অশিষ্ট হয়ে ওঠেন,—রাবেয়ার সুপুষ্ট সুদৃঢ় বুকে থাবা বসান, বলেন, 'আমার কোন শত্রু নেই—এ রকম উদ্ভট ভাবনায় নিজেকে নষ্ট করে ফেল না।'

'আমি আবার নিজেকে কি নষ্ট করলাম! আর শত্রু তোমার আছে, এই জা[illegible]জেই—শিবপ্রধান।'

পরমাশ্চর্য গলায় ক্যাপ্টেন বলেন, 'আমি তো বুঝতে পারছি না, সে কেন আমার মৃত্যু চাইবে?'

চকিতে রাবেয়া যেন ক্যাপ্টেনের বুকে দাঁত বসিয়ে দেয়, একটানে নিজের মসৃণ ভেজা শঙ্খ বুক উমুক্ত করে, নিজের দুই বিশাল স্তনকেও অনাবৃত করে দেখায়, 'এই এদের জন্য। চেয়ে দেখো। কতন যুগ যে মানুষ সমুদ্রের নোনাপানি ছাড়া কিছু দেখে নি, সে আবার এই সমস্তের স্বাদ পেতে চাইবে কি না, বলো? বলো!··· শিয়ালের মুখ থেকে তুমি মুরগীর ছানা ছিনিয়ে নেবে, আর সে তোমায় ছেড়ে দেবে?···তুমি বলেছো, প্রধান আমাদের শাদীর জন্য ওকালতি করেছে। আসলে মোটেই তা করে নি। ও চেয়েছিল, যাতে বা-জান মত না দেয়। ওর উস্কানিতেই বা-জান অত রূপেয়া চেয়ে বসেছিল তোমার কাছে।···নেহাত্ তুমি ক্যাপ্টেন, আর প্রধান সারেং···'

রাবেয়ার স্বরে, দৃষ্টিতে আগুন ঝরে। সুন্দর মুখ এমন বিকৃত হয় যেন সে কোন পুরনো গ্যাসট্রিক আল্‌সারে কষ্ট পাচ্ছে।

তবু সেই মুখ নিঃসৃত বচন শুনে অধোবদন হল না গোলাম মহম্মদ, 'তবু আমার কাছে তোমার কথাগুলি অস্বচ্ছ ঠেকছে। আমার বুদ্ধি মার্জিত মন; তাই চট করে কোন কিছু মেনে নিতে

পারি না।···আমি শুধু বুঝি, সেদিন শিবপ্রধান প্রকৃতিস্থ ছিল না, মদের ঘোরে যা কিছু করেছে। পরে সে অনুতপ্ত হয়েছে।···রাবেয়া, আমি একজন ক্যাপ্টেন। বিচারক। কুসংস্কারের বশে আমি কি কাউকে সন্দেহ করতে পারি? আমি সব সময়ই প্রমান চাইবো।'

রাবেয়া হিম দৃষ্টিতে গোলাম মহম্মদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। গোলামের হাতটা তার শরীর থেকে নামিয়ে রাখে। আবার এসে পোর্টহোলের সামনে দাঁড়ায়। এমন সময় ছাদ থেকে 'মহল' ছাড়বার প্রাথমিক ওয়ার্নিং বেল বাজায় শিবপ্রধান। আঁতকে চিৎকার করে ওঠে ট্যাগ। রাবেয়া একটু চমকায়। তার [illegible]নিদ্র দুই চক্ষু নক্ষত্রলোকে বিচরণরত। এক সময়ে তা স্থিরবদ্ধ হয় হলুদ চাঁদের ওপর।

গোলাম মহম্মদের প্রতি প্রেমে নয়, মোহে নয়, নিছক যেন একটা প্রতিজ্ঞা পালনেই রাবেয়া বিড় বিড় করে দুই ছত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে।

পোর্টহোলের মধ্যদিয়ে হলুদ চাঁদের দিকেই চেয়ে ক্যাপ্টেনকে শুনিয়ে শুনিয়ে রাবেয়া বলে, 'যুক্তি খোঁজে! এখনো বুঝতে পারছে না, মৃত্যু কত অনিবার্য! ঐ হলুদ চাঁদটাকে যেদিন কৃষ্ণপক্ষ এসে সম্পূর্ণ গ্রাস করবে, তোমার জীবনও সেইদিন ইতি হবে।··· এখন আমার প্রতিটি কাজে তুমি গররাজী হচ্ছো, অথচ, আর দু'দিনের মধ্যে তোমার অবস্থা শুশ্রূষারও বাইরে চলে যাবে।···'

ক্যাপ্টেন বাংক থেকে জবাব দেন, 'তুমি যা বলছো সবটাই আবেগ, সংস্কার ও বিশ্বাসের বশে। যুক্তি দিয়ে আমার কথা তো তুমি খণ্ডন করতে পারছো না।'

'যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যায়? যদি যেতো, তবে তোমার শিক্ষিত ডাক্তার কেন রোগ ধরতে পারলেন না?'

'এক ডাক্তার না পারুক অন্য ডাক্তার পারবেন।'

রাবেয়া অধৈর্যের সঙ্গে বলে, 'তুমি চুপ করো। আমাকে ভাবতে দাও।'

'বেশ ভাবো।'

'হ্যাঁ, ভাববো। আর এও বুঝেছি, আমার চেয়ে তোমার এখন ঐ প্রধানেরই ওপর বেশী আস্থা। অথচ, একটিবারও ভাবছোনা, শয়তানটা এই ক'দিনে একবারও তোমাকে দেখতে এলোনা।'

'ও আসছে না লজ্জায়; তোমার সামনে আসতে ওর লজ্জা।'

'লজ্জা!' সাপের জিহ্বার মতন লকলকিয়ে ওঠে রাবেয়ার স্বর, 'আচ্ছা', আমি ওর সব লজ্জা ভেঙ্গে দেবো!'

ক্যাপ্টেন কৌতুকের সঙ্গে আরো কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিলেন; পারলেন না। হঠাৎ তাঁর জঠর ঠেলে ভয়ানক একটা যন্ত্রণা পাকিয়ে পাকিয়ে গলা অব্দি ঠেলে আসে। জলাতঙ্ক রোগীর মতন চিৎকার করে ওঠেন গোলাম মহম্মদ। বাংকের ওপর থেকে গলা ঝুলিয়ে গভীর কৃষ্ণ রঙের বমি করেন খানিকটা। এবং তারপরই হাত-পা সব নিশ্চল। সংজ্ঞাহীন গোলাম মহম্মদ।

রাবেয়া শুধু মাত্র ওঁর মাথাটা আবার বালিশে এনে রাখে। কাউকে ডাকে না। কেবিনের কপাট বন্ধ করে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে আসে।

এখন 'মহল' দুলে উঠেছে। পোর্টব্লেয়ারের জেটি ছেড়ে আবার এর নাতিদীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রা। সেই কারণে জাহাজীদের ধরনধারণও বদলে গেছে। খোলের দরজায় তালা আটছে কে যেন। অনেকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে জাহাজীদের কাজকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে নিচ্ছে শিবপ্রধান। টুইন ডেকের এক কোনে স্তূপাকৃতি এস্তার জ্বালানী কয়লা, কিছু কাঠ, তক্তা, দড়ি-দড়া, মুর্গীর পালক, কলার কাঁদি ও ঝুনো নারকেল।

ঐ স্তূপের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক ভৈরব ফণী সিগ্রেট

ধরিয়েছে। আবছা আলোতে সুন্দর লোকটাকে আরো সুপুরুষ মনে হয়। রাবেয়া তার মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসকে চাপতে পারে না।

দীর্ঘশ্বাসটাকে মুক্তি দিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে কেমন অদ্ভুত করে যেন হাসল যুবতী। চাঁদ, প্রায় পূর্ণ চাঁদ গোলাকার ও হলুদ রং— দুইখণ্ড মেঘের সন্ধিস্থলে খাবি খাচ্ছে। শীত শীত করছে। গলায় কম্ফার্টার জড়ানো শরৎ ভূষণ একবার এঞ্জিন-ঘর থেকে উঁকি মারে, হয়তো রাবেয়াকে সে খেয়াল করলো না। ঠোঁটের কোনে পরাভূত বিনীত হাসি এঁকে রাবেয়া ঐ চাঁদের দিকেই চেয়ে আছে। সে মনে মনে ঐ চাঁদের দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করে—আহা! তুমি বেঁচে থাকো বহুকাল! কেননা, সে বুঝেছে, যে মুহূর্তে রাহুমূর্তিতে কৃষ্ণপক্ষ ঐ চাঁদকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবে গোলাম মহম্মদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন।

মৃত্যু মাত্রই এক অর্থে স্বাভাবিক, অন্য অর্থে অস্বাভাবিক। কাজেই গোলাম মহম্মদের মৃত্যু নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। অথচ, এই মৃত্যুর পরিণতিতে কপাল খুলে যাবে শিবপ্রধানের। সে নির্ঘাৎ এই 'মহল'-এ নিজের প্রভুত্ব কায়েম করবে এবং যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করবে রাবেয়াকে। এবং আরো ভয়ংকর পরিণতি—এই জাহাজের সবচেয়ে সুন্দর মানুষটাকেও সে একদিন মৃত্যু-বানে খতম করবে।

সুতরাং ছোট্ট একটা তেঁতুল বীচির মতন কঠিন অনুজ্ঞা রাবেয়ার— সবকিছু শেষ হয়ে যাবার আগে শিবপ্রধানকেই শেষ করতে হবে! কাজটা কঠিন। এই কলঙ্কের যুগে কোন কোন মানুষ অতীতের মন্ত্র-টন্ত্র না ভুললেও, বর্তমান যুগের সতর্কতা ও শয়তানিটুকু যথারীতি রপ্ত করে আছে। যদিও সময় বড় কম,—চাঁদের আয়ু আর মোটে বারো দিন,—কাজ তাকে হাসিল করতেই হবে। চাতুরালিতে সে নিজে কি কিছু কম?

রাবেয়া সুন্দরী, রাবেয়া যুবতী, জানে—তার যৌবন কত সুন্দর! আঁজলা আঁজলা আগুন ছড়ানো রয়েছে নিছক রক্ত মাংসের এই শরীরে। সেই শরীর, মণিহারী দোকানের চকমাদারী প্রসাধনী রঙিন রিবনের মতন আপন ঐশ্বর্যে ঝিলমিল ঝিলমিল করতে থাকে।···

সময়ও নদীর স্রোতের নিয়মে আরো দুটো দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেল!

-ব্যবসায়িক ধাঁন্ধায় 'মহল' তার গতি বজায় রেখেছে। কোম্পানীর লোক মাসকাবারী পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে ক'লকাতায় সদর দপ্তরে বার্তা পৌঁছেছে—'মহল' এর ক্যাপ্টেন মরণাপন্ন এবং সারেং শিবপ্রধান যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কোম্পানীর স্বার্থ দেখছে। ক'লকাতা থেকে গ্রীন-সিগন্যাল এলো—শিবপ্রধান এই স্বার্থটুকু তুমি দেখে যাও; যদি ক্যাপ্টেন চোখ বোজেন, ঐ মসনদ আর তোমার কাছে অলীক থাকবে না!···

সুতরাং ট্যাগ 'মহল'-এর ব্যস্ততা বেড়েছে বৈ কমে নি। মালগুদামে মাল ঠাসা হয়, খালাস করা হয়। জাহাজীদের চোখের দিশা ঘুরে গেছে, কেউ কেউ ঐ কুৎসিৎ সারেং টাকেই আজকাল 'স্যার' 'ছোট-ক্যাপ্টেন' ইত্যাদি সব সম্মানসূচক শব্দে আপ্যায়িত করছে। ওরা খুব দ্রুত ভুলে যাচ্ছে, জাহাজের একমাত্র কেবিনটাতে এখনো সেই মানুষটা শুয়ে আছেন, যাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে তমাম 'মহল' একদিন নিশ্চল হতো, কেঁপে কেঁপে উঠতো, গতি পেতো!···

আসলে কেউই হয়তো গোলাম মহম্মদকে ভোলে নি, কিন্তু তাঁর খবর নিতে ভয় পায়। মানুষটার পরিণতি সম্পর্কে তারা আর দ্বি-মত পোষন করে না। যে কোন নিশুতি নিঝুম রাতে রাবেয়ার চাপা কান্না অসম্ভব নয়।

গোলাম মহম্মদের মুখের ওপর আর চোখ রাখা যায় না। এ

মানুষ সে মানুষ নয়। কোন অদৃশ্য অজগর চেটে-পুটে খাচ্ছে তাঁকে। এখন শুধু মাত্র মরণের হিক্কা তুলতে বাকি। হাড় সর্বস্ব তৈলাক্ত শরীরে শুধু হৃদপিণ্ডের ধুক্‌পুকানি। এই ছোট্ট কেবিনে ঠাসা এখন মরণের ছায়া। শুধু শিয়রে দাঁড়ানো শুদ্ধাচারিণী পতিব্রতা (?) রাবেয়া ঠেলে সরিয়ে রেখেছে অমোঘ মৃত্যুকে।...

দুই দিন পর আবেশাচ্ছন্ন গলায় গোঙানি তুলে আবার অচৈতন্য হয়ে পড়লেন গোলাম মহম্মদ।

রাবেয়া তখন তার সালোয়ার-কামিজ, সায়া-শাড়ি গুছিয়ে পোটলা বাঁধছে একটা কাপড়ে। পরে সেই পোটলা তুলে রজকিনী-ছন্দে ডেক ধরে গ্যাঙওয়েয়ের দিকে হাঁটতে থাকে। কিন্তু গ্যাঙওয়েতে শিবপ্রধানের সঙ্গে মুখোমুখি। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, রুক্ষ চুল-দাড়ি সামুদ্রিক বাতাসে উড়ছে, দুই চক্ষু ভাটার মতন জ্বলন্ত।

'কোথায় যাচ্ছো ?'

প্রধানের কণ্ঠস্বর শুনলো রাবেয়া অনেকদিন পর। মনে হয় না, কোন মানুষের আওয়াজ, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা প্রেতায়িত স্বর : কোথায় যাচ্ছো ?

অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করলো রাবেয়া, 'জাহান্নামে।'

প্রধান যেন চমকায়, 'মানে ?'

'মানে তোমাদের এই 'মহল' ছেড়ে আবার সেই বনেই ফিরে যাবো।'

'হঠাৎ ?'

রাবেয়া ঈষৎ ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো, 'যার ভরষাতে এসেছিলাম, সে-ই যখন ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে !'

শিবপ্রধানের চোখ অতিমাত্রায় চক্‌ চক্‌ ক'রে ওঠে, 'ক্যাপ্টেনের অবস্থা কি খুব খারাপ ?'

'তা না হলে কি আমি পোটলা-পুটলি নিয়ে পালিয়ে যাই ?'

'পালাবে কেন?'

রাবেয়ার মুখে আবার সেই মিষ্টি রহস্যময় হাসি, 'মেয়েরা হচ্ছে পরগাছা। মূল গাছটাই যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন আর তার থেকে রসসংগ্রহ করবো কি ভাবে? আমাকে অন্যগাছের সন্ধানে যেতেই হবে।'

প্রধানের সর্বাঙ্গ বেয়ে পিচ্ছিল লোভ গড়ায় 'সে রকম কোন গাছ কি এই 'মহল'-এ নাই?'

রাবেয়া অপাঙ্গে দেখে প্রধানকে; চাপা গলায় বলে, 'আছে। আদত বটবৃক্ষ আছে। কিন্তু তার কাণ্ডজ্ঞানটা বড় কম। নিজের জিনিস অপরের হাতে তুলে দিয়ে আবার মাতলামির ঢঙে হাত বাড়ায়।'

মরীয়া হয়ে ওঠে যেন শিবপ্রধান, 'সে ভুল আমি শোধরাবো। শুধু বলো, তুমি আমার কাছে থাকবে—'

খিল খিল ক'রে হাসে রাবেয়া। বলে, 'কোথায় পাকো তুমি, চাঁদ?'

আঙুল তুলে ট্যাগের ছাদ দেখায় প্রধান, 'ঐখানে। সকলের আড়ালে। কিছুদিন ওখানেই থাকবো। অন্ততঃ যতদিন আকাশে ঐ চাঁদটা ঘুরবে। তারপর—'

'তারপর কেবিনে। কেমন? বেশ, আমি ততদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।'

'কিন্তু এখন—'

'দেখা যাবে খন। রাতে ঘুমিওনা। আর শরীর-টরীরগুলো একটু পরিষ্কার রেখো।'

যেন লজ্জা পায় প্রধান, 'খুব কম রাতেই আমি ঘুমোই; তুমি এ মহলে আসবার পর থেকে আমার চোখ থেকে ঘুম বিদায় নিয়েছে। আর শরীরের কথা বলছো? তারও দুরবস্থা তোমারই বিরহে।'

আর এক দফা খিল খিল হেসে কোমর-পাছা দোলাতে দোলাতে আবার কেবিনের দিকেই ফিরে চলে রাবেয়া। পশ্চাদ্বর্তিনী রূপসীর সেই ছন্দ-মুখ অসহনীয় যন্ত্রণায় হজম করছে শিবপ্রধান।

ক্রমশ রাত বাড়ে। নির্জীব ক্যাপ্টেনের সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। তিনি হাঁ করে আছেন। রাবেয়া তাঁর মুখে ফোঁটা ফোঁটা ফলের রস দেয়। ক্যাপ্টেন কি যেন বলেন, শব্দের অসংলগ্নতায় বোঝা যায় না। এক সময় তিনি শিশুর মতন অবিমিশ্র হাসি হাসেন। তখন রাবেয়া একহাতে তাঁর কপাল চেপে, অন্যহাতে বিছানার নীচ থেকে কাপড়ে মোড়া মন্ত্রপূত বটুয়াটা বের করে, পুরনো পোটলাটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে, পোটলাটা নিয়ে পায়ে পায়ে সন্তর্পনে কেবিন ছেড়ে ডেকে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু স্বস্তি নাই।

ডেকে আর এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি মুখে সিগ্রেট ধরিয়ে যেন ওৎ পেতে আছে।

'কোথায় চললে ?'

'যেখানেই যাই, এখন কোন প্রশ্ন করো না।'

'বাঃ। আমি তোমার জন্য কখন থেকে কিচেনে—'

'দয়া করে দুটোদিন সবুর করো। আগে শয়তানটাকে খতম করি।'

'সর্বনাশ! তুমি প্রধানের কাছে চলেছো।'

'হাঁ।'

'সাহস তো কম নয়।'

'উপায় নাই।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

'না।'

'আমি তোমাকে অনুসরণ করবো।'

'না!'

'আমি যে এ সহ্য করতে পারবো না।'

'পারতে হবে।'

'প্রধান যে তোমায় নষ্ট করবে।'

'আমি কি নষ্ট হইনি? তুমি নিজে কি আমাকে পবিত্র থাকতে দিয়েছো?'

'আমি যে তোমাকে ভালোবাসি।'

'ভালো আমাকে সকলেই বাসে।'

'তাই বলে প্রধান—'

'বললাম তো, উপায় নাই।'...

ছায়ামূর্তিকে এড়িয়ে বা, বজ্রাহত করে ছাদে ওঠার সংকীর্ণ সিঁড়িতে পা রাখে রাবেয়া। আজকের চাঁদ যেন প্রতিপদের: যদিও কৃষ্ণপক্ষ ঘনায়মান, পরিচ্ছন্ন মার্জিত জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক আপ্লুত।...

ছাদে উঠে রাবেয়া দেখতে পায়, চিমনী-সংলগ্ন সেই তাঁবুর ঘরটা। অদ্ভুত থমথমানি। রাবেয়ার শরীরটা হঠাৎ ছম্ ছম্ করে ওঠে। বুঝি সে কোন লাসকাটা ঘরের দিকে আগুয়ান। নিজেকে কৈফিয়ৎ দেয় রাবেয়া, 'উপায় ছিল না! এ ছাড়া উপায় ছিল না।...'

মেরু দাঁড়া টান করে ভয়ংকর প্রধান প্রতীক্ষারত।

'একেবারে পোটলা পুটলি নিয়ে চলে এসেছো?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ে রাবেয়া। পোটলাটা নামিয়ে রাখে চিমনীর গায়ে।

শিবপ্রধানের কাছে এ এক আশ্চর্য থ্রিল। পাইন দেবদারুর জঙ্গলে বেড়ে ওঠা সেই অসাধারণ যৌবনবতী অবশেষে নিশিথ-অভিসারিনী।

দুর্গন্ধ। উৎকট দুর্গন্ধ, শুকনো দাড়ির কামড় সহ্য করতে করতে রাবেয়া তার খয়রাত দেয়। সেই গল গল ধোঁয়া নিঃসৃত চিমনীর পায়ের কাছে। সাক্ষী ঐ হলুদ চাঁদ। অফুরন্ত উৎসাহ প্রধানের। শিকারী যেমন গুলিবিদ্ধ পাখির পালক ছাড়ায়…।

রাবেয়ার সুগোল, সুশ্রী চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়ায়। পশুটা বড় নির্মম, রোমশ নখর পাঁচ আঙুল তার শরীরের সুন্দর মাংসল অংশগুলি যেন চিরে ফেলছে। কতক্ষণে আসবে ওর উৎসবান্তের অবসাদ?…

অবসাদ এলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

সেই কয়েকটি মুহূর্ত যেন দুঃস্বপ্নভরা কয়েক যুগ।

কয়েক যুগ অতিক্রম ক'রে প্রতিহিংসা পরায়ন শায়িতা যুবতী দেখে, সে লুণ্ঠিতা, বিবস্ত্র মানবী!

আর তার পাশে মধ্যযুগের রণক্লান্ত ক্ষত-বিক্ষত এক নাইট যেন পড়ে আছে—অবশ, অচল। এই তো সুযোগ! এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না রাবেয়া! এমন একটি অসতর্ক মুহূর্ত আর নাও আসতে পারে!

রাবেয়া সন্তর্পনে হাত বাড়ায়। হাত বাড়ায় পোটলাটার দিকে।

হাঁ, এই তো সেই নিরেট হিমেল অস্ত্রটা। আয়না—চক চকে বটুয়া।…

প্রধান কিছুই টের পায় নি। আবেশে বুজেছিল তার দুই চোখ। বড় সুখ! বড় অবসাদ! আজ, এই রাত যেন আর শেষ না হয়!

হঠাৎ সে শুনতে পেলো, রাবেয়া ফিস্ ফিসিয়ে বলছে: এই, চোখ মেলে তাকাও। তাকাও সোনা!

চোখ মেলে তাকায় শিবপ্রধান।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গোটা সূর্যের আলো যেন ঝলকে দেয় তাকে।

রাবেয়া এই জ্যোৎস্না প্লাবনের সুযোগ নিয়ে ইস্পাতের আয়না দেখিয়েছে তাকে।

বিকট চিৎকার করে দু'হাতে চোখ ঢাকে প্রধান।

একবার চেষ্টাও করে উঠে বসতে।

পারে না।

অসহনীয় যন্ত্রণায় চিমনীর গায়েই বার বার তিন বার মাথা ঠোকে সে।

তারপর সব নিশ্চুপ।

আর ঠিক তখন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা মানুষের মতন গোলাম মহম্মদ প্রায় পরিষ্কার গলাতেই ডাকেন : রাবেয়া! রাবেয়া!…

কিচেন থেকে ভৈরব ফণী জবাব দেয় : ছাদে হাওয়া খাচ্ছেন।

: এখনই একবার ডেকে দাও তাঁকে।…ঘরটা এত অন্ধকার কেন? পোর্টহোলের কাঁচটা সরিয়ে দিতে পারে না?…